অন্তরীপ

মদন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ : দশহরা, ১৩৫৮

প্রকাশক :

সুহৃদ রুদ্র

৩২, মদন মিত্র লেন

মুদ্রাকর :

মোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

রুদ্র প্রেস।

৩২, মদন মিত্র লেন।

প্রচ্ছদ পট :

লক্ষ্মীকান্ত রায়

প্রাপ্তিস্থান :

প্রকাশনী, ১৫।৭ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

মূল্য : ২॥০

মা ও বাবা-কে

'অন্তরীপ' আমার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস। ইতিপূর্বে 'নিপাতন' নামে একটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে 'দ্বন্দ্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'অন্তরীপ' কোন সাময়িক পত্রে প্রকাশ না করেই সরাসরি গ্রন্থবদ্ধ করা হলো।

যুদ্ধোত্তর অতিসাম্প্রতিক সমাজের পটভূমিতে উপন্যাসের চরিত্র-গুলি চলাফেরা করছে। জীবন সম্বন্ধে নতুন মূল্যবোধ এখনো গড়ে ওঠেনি, অথচ পুরাতন মূল্যমানেও আস্থা নেই; এই প্রশ্নসংকুল সময়ের পরিসরে যে আখ্যানের পরিকল্পনা তার উপসংহার ভবিষ্যতের কোন সুসম্মত সমাধান ঘটলে হয়তো ভাল হতো। কিন্তু সমাধান-নির্দেশ ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব বহির্ভূত বিবেচনায় উপস্থাপনার যথাযথতার দিকে মনোনিবেশ করেছি।

প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ করতে গিয়ে অনেকের কথাই মনে পড়ছে। তাঁদের পরিচয় সাধারণের কাছে অপ্রাসংগিক ভেবে উল্লেখ না করাই শোভন মনে করলাম। তবে একজনের সলজ্জ নিষেধ সত্বেও তার নাম উল্লেখ করছি: আমার সহধর্মিনী শ্যামলী বন্দোপাধ্যায়। এ ধরণের সম্পর্কিত জনের কাছ থেকে উৎসাহ পাওয়া সাধারণত সাহিত্যিকের ভাগ্যে ঘটে না।

জোড়াসাঁকো অঞ্চলে পুরোণো বনেদী বোস পরিবারের রাসবিহারী বোসই হলেন পুরোণো আভিজাত্যের শেষ প্রতীক—বালি-খসা বাড়ীটার বিরাট ঐতিহ্যের শেষ স্বাক্ষর। রাসবিহারীর যৌবন কিন্তু ঐ পুরোণো গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাইলো না—বেচে দিলেন বাড়ীটা।

তারপর—বালিগঞ্জি এলাকায় আধুনিক সুরম্য এক "নীড়" বাঁধলেন। সাদা ধব্‌ধবে ছবির মত বাড়ীটাকে ঘিরে প্রশস্ত বাগান। দেশী বিলেতী ফুল আর পাতায় ভরা বাগানখানা—বাসন্তী দেবী যেদিন প্রথম দেখলেন, সেদিন এতো খুসী হয়েছিলেন—রাসবিহারী আজো ভুলতে পারেন নি সে কথা। স্ত্রী বাসন্তী দেবী, এতো সহজে যৌবন-ধর্মের কাছে সমস্ত সংস্কারকে তুচ্ছ করে দেবেন, ভাবতে পারেন নি।

আর তাঁর মা—সিদ্ধেশ্বরী দেবী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে শুধু বারে বারে বলেছিলেন, এটা কিন্তু ভালো করলি না রাসু, পৈতৃক ভিটে বিক্রি করে এই বন-বাদাড়ে এসে কি যে ভালো হলো বুঝি না বাপু। পড়সি নেই, লোকজন নেই, গঙ্গা নেই, ধর্ম-কর্ম সব গেল—গৃহদেবতা তাও ঘরে না রেখে লোচনঠাকুরকে দিয়ে এলে—যাক্ সব যাক্, আর আমিই বা থাকি কেন, অনেক পুরোণো হয়েছি, কাশী পাঠিয়ে দে আমায়।—মার সেই কাতর খেদোক্তি আজও মনে পড়ে রাসবিহারীর। চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে সেই স্নিগ্ধ শুচিস্মিত মার সবহারানো মুখটা।

রাসবিহারী আজ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শেষ ক'রেন এক একটি কাহিনীকে। কিন্তু শেষ করলেও শেষ হয় না। আবার আসে অজান্তে। আর বাসন্তীকে আশ্চর্য্য লাগে—সত্যিই আশ্চর্য্য সে। রাসবিহারী কোন মিল খুঁজে পান না, সেই প্রথম বিবাহিত জীবনের যার অনুরক্তা স্নিগ্ধা পবিত্র সরল হাসিখুসী বাসন্তীকে। হারিয়ে গেল বালিগঞ্জি এলাকায় প্রথম জীবন। মা কাশী গেলেন—বাসন্তীর ঠাকুর পূজার পাঠ গেল উঠে। পুরোণো বাড়ীতে ভোরের আলোতে সদ্যস্নাতা পূজা-শেষের বাসন্তীর সেই শুভ্র সুন্দর রূপ দেখতেন তিনি প্রথম জেগে—চা এনে ডাক দিতো মৃদু সুরে, প্রভাতী আলাপের মত। কিন্তু নতুন বালিগঞ্জি পাড়ায় নতুন কায়দা। খাবার ঘরে লম্বা টেবিল পড়ল—সকালে ঠাকুর চাকর সংযোগ করতো তাদের ঐ টেবিলে চায়ের মাধ্যমে। রাতের ঝড়ের পর ভোরে ক্লান্তি নিয়ে আসতো বাসন্তী চায়ের টেবিলে। দেখা হতো। কিছু চাওয়া থাকতো ওর চোখের চাহনি মধ্যে লুকোনো—এও বেশ মনে পড়ে রাসবিহারীর।

রাসবিহারী বেশ বুঝতে পারেন বাসন্তী কালের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। আর তিনিও এগিয়ে ছিলেন কিন্তু পাচ্ছেন না। এখন দাঁড়িয়ে পড়েছেন—বিচার করেন, অনুতাপ করেন, পুরোণো স্মৃতির মধ্যে বসে ঘুরপাক খান—আজকের বাসন্তী আর তার জগতের সঙ্গে জীবন-সংযোগ নেই রাসবিহারীর! রাসবিহারী আজ শুধু দর্শক মাত্র। মাসান্তে পেনশনের টাকা, কিছু কোম্পানীর কাগজের সুদের টাকা

বাসন্তীকে দিয়ে খালাস হন। ব্যস—তারপর কি দিয়ে কি হয়, ধার হচ্ছে কি না—কিছুই খোঁজ রাখেন না। ছেলেমেয়েরা ক্বচিৎ কখন দেখা করে, কথা বলে। থাকেন বাগানের শেষ-প্রান্তে, বাড়ীর পিছনে ছোট একটা খোড়ো বাংলোতে। প্রথম যৌবনে সখ করে এটি করেছিলেন, লাইব্রেরী করবেন বলে। লাইব্রেরী করেও ছিলেন। কয়েক সারি আলমারী ভর্ত্তি বই অনেক বছর ধরে বাস করেছে এখানে। কিন্তু তাদের সঙ্গে আজ তিনিও এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। ঐ সব ইতিহাস, দর্শন আর উপন্যাসের সঙ্গে অনেকখানি মিল আছে।

আর বাসন্তী, যুগের সঙ্গে, কালের সঙ্গে পা ফেলে চলেছেন। যৌবন চলে গেছে, যাক্ না। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির—তার যৌবন তো আছে। তাদের মধ্যে তাঁরই কামনা জাগ্রত। তাই তিনি চলেছেন ওদেরই সঙ্গে। ফুরিয়ে যাননি রাসবিহারীর মতন। পুরোণো যুগের স্মৃতির মধ্যে ঘুরপাক খান কই। নতুন নতুন ঘটনাই তাঁর পরিচিত। তবু রক্তের তেজ আজ কমে গেছে, তাই বর্তমানকে উপেক্ষা না করলেও ইতস্তত করেন। স্বামী সরে গেছে। সাতটি সন্তান। তাদের রক্তে জোয়ার। সময় সময় দিশে পান না। কি দিয়ে কি করবেন। আর্থিক সাচ্ছন্দ আজকাল নেই। মোটা আয় বন্ধ। সংসার চালানো, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া, আভিজাত্যের ঠাট বজায় রাখা ইত্যাদি—কোন কিছুই বন্ধ হয়নি। তাই গভীর রাতে ঘুম আসে না—দেনার অঙ্ক বেড়ে চলেছে—কি দিয়ে কি করবেন তাই ভাবেন।

তবু ভালো লাগে এ সব। কিন্তু ঐ লাইব্রেরী ঘরে আধ ঘণ্টা রাসবিহারীর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়াকে দমবন্ধ হওয়ার সমান মনে করেন বাসন্তী।

তিন ছেলের মধ্যে একটিও তাঁর মনের মত নয়। আর বাপের স্বভাব পায়নি কেউ। তবে ছোট দিব্যেন্দু, অনেকটা রাসবিহারীর মতন। বিশেষ করে প্রথম বিবাহিত জীবনে যেমনটা রাসবিহারীকে দেখেছিলেন বাসন্তী, অনেকটা তেমনি। তাই ভয় হয় বাসন্তীর আজকাল। কে জানে ও হয়ত আঘাত দিয়ে বর্তমানকে গুঁড়ো করে দিয়ে যাবে।

দিব্যেন্দু ছেলেটা কি রকম যেন হয়ে যাচ্ছে। দিনরাত বসে বসে কি ভাবে, তারপর হঠাৎ এমন একটা কিছু করে ফেলে যার সঙ্গে পারিবারিক আভিজাত্যের কোন যোগসূত্র খুঁজে পাননা বাসন্তী দেবী। এম, এ পড়ছে—কিন্তু পড়াশুনা সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন করা চলবে না—কেন শুনি? বাপ-মার সংসারে থাকবে—কৈফিয়ৎ তলব করার অধিকার নিশ্চয় আছে বইকি—কিন্তু শোনে কে।

অজয় শুনেছিলো? সংসারে এক পয়সা দিয়ে সাহায্য করে? বিয়ে করেছে, শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্কটাই বড়, যেন মা বাবা, ভাইবোন সব পর হয়ে গেল! বাড়ীতেই আসে না আজকাল। ইনকাম ট্যাক্সের উকিল শ্বশুর—প্রচুর পয়সা। তাঁরই এক মেয়ে—রীতা; রোগা, ফরসা, অহঙ্কারদীপ্ত মুখখানা চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাসন্তী দেবীর। ঠোঁট কামড়ে ধরেন—পর করে দিলে ছেলেটাকে। কত আশা করেছিলেন ওর

'পর, বড় ছেলে! মেজ ছেলে শিব্যেন্দুঃ তার'পর কোন আশা করেন না বাসন্তীদেবী। নিজের দায়িত্বই নিতে পারে না সে, সংসার দেখবে—বসে বসে বাড়ীর গিলবে আর মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দেবে, কবিতা লিখবে। কোন কিছুই সে গভীর দেখে না, চিন্তা করে না। হাসি আর হাততালি দিয়ে কাটিয়ে দিতে চায়। রাগ ধরে বাসন্তী দেবীর ওকে দেখলেই।

বাসন্তী তবু আশা করেন বই কি। মেয়েগুলোকে যদি গড়ে পিটে তুলতে পারেন, সুদ সমেত ফিরিয়ে নিতে পারবেন। বড় মেয়ে গঙ্গোত্রী। চলে গেছে বাসন্তীর নাগালের বাইরে। বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন রাসবিহারী পেনশন নেবার আগেই।

বাসন্তী আপত্তি করেছিলেনঃ একটা পাশও করলে না যে, বিয়ের বয়সই হয়নি। এর মধ্যে বিয়ে! তুমি দিন-দিন কি যেন হচ্ছো।

রাসবিহারী বলেছিলেন, বলছি ঠিক, বিয়ের বয়সে বিয়েটা হওয়াই ভাল। আর, পাত্রটিও ভাল—ভাল ভাবেই পাশ করেছে মেডিকেল কলেজ থেকে।

—যা খুসি কর, আমার কিন্তু ইচ্ছে নয়। খুসি হতে পারেন নি বাসন্তীদেবী।

কিন্তু আজ তো রাসবিহারী তাঁর আশাকে ভেঙ্গে দিতে পারবেন না—সরে গেছেন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়ে। আজ সবকিছুরই কর্তৃত্ব করে চলেছেন বাসন্তী দেবী। আজ যা খুসি তাই করতে পারেন তিনি তাঁর মেয়েদের নিয়ে—চিত্রা, বিচিত্রা আর সুচিত্রা। এ বিশ্বাস বাসন্তী দেবীর আছে। তাই তাদের দিকেই আজ বাসন্তী

তাঁর মনকে নিয়োজিত করেছেন। যে মন রাসবিহারীতে ভরপুর ছিলো, সে মন রাসবিহারীকে ছেড়ে এগিয়ে চলে গেছে। তাই আজ মাঝে মাঝে ভুলও হয়, তাঁর স্বামী রাসবিহারী আজও বেঁচে আছেন।

গভীর রাতে ঘুম না এলে, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বাসন্তী দেবী চমকে ওঠেন লাইব্রেরী ঘরের আলোর রেখা দেখে। ভয় হয় কেমন যেন মনের মধ্যে। অনিশ্চিত অন্ধকার সারা মনটাকে আচ্ছন্ন করে। সব গুলিয়ে যায়। কোনমতে বিছানায় এসে শুয়ে পড়েন। পাখীর নীড়ের মত রাসবিহারীর নীড় আলো আর আঁধারে ক্লান্ত ম্লান চোখে রাত শেষে ইতিহাসের একখানি পাতা উলটিয়ে যায়।

তারপর আবার ভোরের আলোতে নতুন দিনের সূচনায় নীড় জেগে ওঠে আস্তে আস্তে। সাদা ধবধবে বাড়ীটাকে ঘিরে আবার কাহিনী সৃষ্টির সময় আসে।

ভোরে কোকিল ডেকে গেছে। বসন্তের যৌবন ঃ চঞ্চল মূহূর্ত্ত উড়িয়ে দিয়ে ফুরিয়ে যেতে চাচ্ছে। নীড়ে ঘেরা সারা বাগানখানায় দখিণ হাওয়ার হিল্লোল। আর সেই হিল্লোলে প্রাণমন মাতানো সুবাস।

রাসবিহারীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে বাগানে। প্রাণ ভ'রে নিঃশ্বাস নিলেন সেই সুবাসের। ভালো লাগলো। পায়চারি করতে করতে এগিয়ে গেলেন গেটের দিকে। গেটের দুপাশে দুটি কৃষ্ণচূড়া। চুপ করে দেখতে

লাগলেন। আবছা অন্ধকারে গাছ দুটিকে বেশ বড় আর পরিপূর্ণ মনে হলো। মনে মনে হিসেব কষলেন রাসবিহারী, হ্যাঁ ঠিক, অজয়ের বয়েসী গাছদুটি। রাস্তার দিকে তাকালেন, প্রশস্ত রাজপথ। দু পাশে পিচ-ঢালা পথের মধ্যে ট্রামের জন্য বেশ খানিকটা ঘাসে-ভরা পথ নির্দিষ্ট। এ পথ তখনও হয়নি, এমনি দিনেও ঐ গাছ দুটো এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক্‌তো—যেমন করে অজয় আর শিবেন্দু ঐ কোণের ঘরে একা একা পড়ে থাকতো। আর কখন দেখতো কখন দেখতো না। ঠিক তেমনি। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন রাসবিহারী।

সরে এলেন গেটের ধার থেকে। বাড়ীটার সামনের দিকে তাকালেন, সবাই ঘুমচ্ছে ঃ ঐ ঘরে বাসন্তী। তারই পাশের ঘরে চিত্রা, ঐ কোণের ঘরে বিচিত্রা আর সুচিত্রা, তার পাশে শিবেন্দু ঘুমচ্ছে আর কোণের একতলায় দিব্যেন্দু। কিন্তু ওর ঘরে আলো জ্বলছে কেন? ওকি ঘুমচ্ছে না? হয়ত ঘুমচ্ছে। পড়তে পড়তে কি ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছে—কেমন যেন দরদ অনুভব করেন রাসবিহারী দিব্যেন্দুর জন্যে ঃ ছেলেটা সত্যিই ভালো। অনেকবার মনে হয়েছে রাসবিহারীর, বাসন্তীকে বলবেন, একটুখানি যত্ন নিতে। দিন দিন ও যেন পর করে দিচ্ছে ছেলেটাকে।

বিয়াল্লিশ সালের আন্দোলনে জেলে গেল দিব্যেন্দু। কলেজের প্রোশেশন থেকে হঠাৎ গ্রেপ্তার হয়ে গেল—রাসবিহারী একটু দমে গিয়েছিলেন। কিন্তু বাসন্তী উগ্র গলায় জানিয়েছিলেন; ওসব ছেলের ঐ ভাল, পচুক না জেলে, তবে যদি শিক্ষা হয়। সত্যি দরদ নেই বাসন্তীর। আর বলে দরদ ফিরিয়ে আনতে পারবেন

না রাসবিহারী। তাই বলেন নি। একটা সান্ত্বনা খুঁজে পান। আঘাতে তো দিব্যেন্দু ভেঙ্গে পড়ে না। স্বাতন্ত্র্য আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছে ও। সেই জন্যেই আরো ভাল লাগে।

রাসবিহারী এগিয়ে গেলেন দিব্যেন্দুর ঘরের জানলার কাছে। দেখলেন, দিব্যেন্দু নেই। কে জানে কোথায় গেছে—আস্তে আস্তে লাইব্রেরী ঘরের দিকে এগুতে লাগলেন।

ঠাকুর জেগেছে। ভোলাকে ডাকছে উনুনে আগুন দিতে। এবার রোদ উঠবে।

লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে চমকে গেলেন রাসবিহারী। দিব্যেন্দু স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছে। আবছা আলোতে দেখতে পেলেন রাস-বিহারী। আলোটা জ্বাললেন। একঝলক আলোক দেখে চমকালো দিব্যেন্দু। তারপর চাইলো ও রাসবিহারী দিকে। চোখে দিশেহারানো দৃষ্টি। রাসবিহারী ওর দিকে লক্ষ্য করেন। ছেলেদের মধ্যে সুপুরুষ বলে ওকে নিয়ে এককালে গর্ব করতেন তিনি বাসন্তীর কাছে। কিন্তু এ কি হয়েছে চেহারা ওর? সারা মুখখানা বিষাদক্লিষ্ট। অনেক কিছু যেন খোয়া গিয়েছে। তাই শারীরিক সুখভোগে অনাসক্ত। কি গিয়েছে ওর, এমন কি!

—বাবা, এবার আর পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছে নেই। হঠাৎ স্তব্ধতা ভেঙ্গে বলে ওঠে, দিব্যেন্দু।

—কেন প্রিপারেশন বুঝি ঠিকমত হয়নি? প্রশ্ন করেন রাসবিহারী।

—ঠিক সে জন্যে নয়, মনটা ভাল যাচ্ছে না তাই। মুখটা নীচু করে বলল দিব্যেন্দু।

—মন কেন ভাল নেই, সঙ্কোচ করো না, বল, রাসবিহারী বললেন আন্তরিকতার সুরে।

—এমনি কেমন যেন, কিছু ভাল লাগে না।

রাসবিহারী চিন্তান্বিত হলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, রাজনীতি করো না আজকাল ?

—খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে নয়। পড়াশুনা করে যতটুকু সময় করতে পারি, করি।

—কি করবে ভবিষ্যতে, এমন কি কিছু ঠিক করেছো মনে মনে ?

—না।

রাসবিহারী আবার চুপ করলেন। বসে চিন্তা করলেন কিছুক্ষণ। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, দেখ, সত্যকে উপলব্ধি করে জীবন-পথ ঠিক কর। দিশেহারা হওয়া ঠিক নয়। যা ভাল তারই একটা বেছে নাও। সাময়িক হতাশা এসে থাকে দিন কতক বাইরে কোথাও ঘুরে এসো। তবে মনে রেখো ব্যষ্টি থেকে সমাজের মঙ্গল করাটাই মানুষের জীবনে চরম আদর্শ। আশা করি তোমার জীবন সেইভাবেই গড়ে উঠুক।

দিব্যেন্দু চুপ করে বসে শুনলো কথাগুলো। ভাল লাগলো। বাবার সঙ্গে চিরকাল ও কম কথা বলেছে। সম্ভ্রমে, সঙ্কোচে দূর থেকে শ্রদ্ধা করেছে। কাছে এসে খুলে কথা বলেনি। আজই প্রথম দিব্যেন্দু তার বাবার কাছে মনের গোপন সমস্যাকে মেলে ধরতে চেষ্টা করলো। সারা রাত ও ঘুমোয় নি। কেন যেন জীবনকে ওর ভাল লাগছে না। কি মূল্য বেঁচে থাকার ? বেঁচে কি হবে! নানা

চিন্তার জালে ঘুরপাক খেয়েছে সারারাত। ভোরে কখন একসময় বাবার কথা মনে হয়েছে, মন খুলে সব কিছু তাঁকে ব্যক্ত করতে ইচ্ছে হয়েছে। সেই তাগিদেই অজান্তে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে দিব্যেন্দু।

—আর একটা কথা, রাসবিহারী বললেন, বাড়ীর কোন খোঁজখবর রাখো?

—না, তবে লক্ষ্য করেছি কি রকম যেন সবাই হয়ে যাচ্ছে কেমন ছাড়া-ছাড়া, যেন ভাড়াটে বাড়ীর বাসিন্দার মত।

—অজয়ের খবর কি?

—দাদাকে অনেকদিন দেখিনি, বাড়ীতে তো আসেই না আজকাল।

—তার খোঁজখবর রাখো কিছু? তার ব্যবসা কেমন চলছে জানো।

—শুনি তো ব্যবসায় প্রচুর লাভ করছে।

—লাভ করছে, ভাল। রাসবিহারী চুপ করলেন।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো। দিব্যেন্দু এবার যেন একটু অস্বস্তি অনুভব করে।

রাসবিহারীর চিন্তাচ্ছন্ন গম্ভীর মুখখানা ধীরে ধীরে আবার প্রশান্ত হয়ে উঠলো। বললেন, তোমাদের এই বর্তমান যুগটা বড় স্পষ্ট নোংরা। এত নোংরা যে মানুষের যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ সেই সব সুন্দর সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে নষ্ট করে দিয়ে কাঠামোটা-কেই বাঁচিয়ে রাখে।

দিব্যেন্দু বুঝলো, কেন বললেন বাবা কথাগুলো। বড় দাদার অন্যায় ব্যবহার ক্ষমা করতে পারেন নি। তাই হয়ত।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনলো দিব্যেন্দু। চোখ তুলে চাইলো ও রাসবিহারীর দিকে—কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে বাবাকে।

—যা অন্যায় তাকে মেনে নিও না। মনে আশা নিয়ে এস, আনন্দ নিয়ে এস, দেখবে জীবন কত সরল, কত সুন্দর। আর দেখ, শরীরটার যত্ন নিও। যাও এখন তাহলে, মাঝে মাঝে দেখা করো, বুঝলে।

দিব্যেন্দু ঘাড় নেড়ে উঠে দাঁড়ালো। দিব্যেন্দুর ভাল লাগলো এই পরিবেশটা—এই লাইব্রেরী ঘর, বাবা আর তাঁর কথাগুলো—মনে কেমন যেন ঝির ঝির হাওয়ার মত শান্তি নেমে এসেছে।

আস্তে আস্তে বাইরে এলো ও। কাঁচা রোদ ঝলমল করছে সবুজ বাগানটাকে ঘিরে। বসন্তের সকাল—মৃদু দখিন হাওয়া, পাখীর কাকলী আর সদ্য জাগা মানুষ—খুব ভাল লাগলো দেখতে। অনেকদিন বাদে মন গুনগুনিয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি পা ফেলে এগিয়ে চললো ও বাড়ীর দিকে। সবাই হয়ত উঠেছে। চা হয়েছে হয়ত।—না, আজ সকলের সঙ্গে বসে চা খেতে হবে, অনেকদিন খাইনি একসঙ্গে!

বাসন্তী উঠেছেন। খাবার ঘরে তীক্ষ্ণ গলা শুনলো দিব্যেন্দু।

—এত দেরি হচ্ছে কেন ঠাকুর, বেলা কি কম হলো?

—এই যে নিয়ে যাই মা।—ঠাকুর উত্তর দিলো।

দিব্যেন্দু খাবার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

—আরে ছোড়দা যে! কি ভাগ্যি আজ, একসঙ্গে চা খাবো।—চিবিয়ে চিবিয়ে চোখ দুটো আড়ে টেনে বলল সুচিত্রা।

দিব্যেন্দু তাকালো সুচিত্রার দিকে। নতুন লাগলো। কেমন যেন চপল চঞ্চল হয়ে উঠেছে সুচিত্রা। মুখখানা নতুন রংএ দীপ্ত। নতুন যৌবন ডগমগ করছে। রংটা আর একটু ফরসা হয়েছে। টানা-টানা চোখ দুটোয় বেপয়োয়াভাব। কালো বেণী খুলে দিয়েছে—একরাশ অন্ধকারের মত কালো চুলগুলোকে কাঁধের দু'পাশে ছড়িয়ে গেছে।

—হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছো কি অত, নতুন নাকি আমরা।—আবার চোখ বাঁকালো সুচিত্রা।

এবার দিব্যেন্দু মৃদু হাসলো। তারপর আস্তে আস্তে সুচিত্রার পাশে এসে বসলো।

বাসন্তী এর মধ্যে একবার দিব্যেন্দুর আপাদমস্তক দেখে নিলেন: কি ছিরিই হচ্ছে, রাস্তার ছোটলোকদের মত।

—মা ছোড়দাকে একটা একতারা কিনে দিও, বাউল বেশটা ষোলো-আনা হবে।—বিচিত্রা টেবিল বাজাতে বাজাতে নির্লিপ্ত স্বরে বলল।

—বড় ফাজিল হচ্ছিস্ যে বাঁদরী, কলেজে কি ফাজলামির Class হচ্ছে নাকি।

—অসভ্যর মত কথা বলো না, ভদ্র ভাবে বলা উচিত। রূঢ় স্বরে বলল বিচিত্রা।

দিব্যেন্দু চমকে গেল—এই বিচিত্রা! মুখে চোখে কেমন অশ্লীল ভাব, চেহারাটাকে পালিশ করেছে এই সকালে। চোখের কোণে কালি পড়েছে। সারা মুখখানায় কমনীয়তার লেশ নেই। উগ্রতা, প্রচণ্ড আগুন-ধরানো উগ্রতা-মাখানো ওর সুন্দর ফরসা

মুখখানায়। নিজের চেহারা সম্বন্ধে ওর অহঙ্কার আছে বরাবরি। কিন্তু এরকম অশীল সম্পূর্ণতা—রূপে, মনে আর প্রকাশ-ভঙ্গিতে—দিব্যেন্দু নতুনই লক্ষ্য করলো।

বিচিত্রার কথার জবাব দিলো না দিব্যেন্দু। ও চিত্রার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল, তোর খবর কি ?

চিত্রা মৃদু হেসে বলল, ভালই, খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুরে বেড়াচ্ছি, গান গাচ্ছি।

বোনেদের মধ্যে এই চিত্রাই একটু শ্যামলী। রংয়ের সঙ্গে স্বভাবের আশ্চর্য্য মিল চিত্রার—শ্যামল বনানীর মত স্নিগ্ধ, শান্ত, উদাস ওর রূপ আর মন। গান গায় চমৎকার। কথা বলে কম। ভাবে বেশী। দিব্যেন্দুর ভাল লাগে চিত্রাকে।

—অনেকদিন তোর গান শুনিনি, শোনাবি আজ ?

—শোনার সময় কোথায় তোমার। তাছাড়া আজকাল ভাল লাগবে! হেসে বলে চিত্রা।

—ভাল লাগবে না কেন শুনি ?

—এমনিই হয়তো।—চিত্রা মার দিকে চেয়ে নিলো একবার। তারপর আবার বলল, অকারণ কখন কখন কারণে দাঁড়ায়, নয় ছোড়দা ?

দিব্যেন্দু বুঝল। চিত্রা কিছু বলতে চাইছিলো, কিন্তু মা থাকাতে বলল না। ও বলল, আপাত-দৃষ্টিতে যা অকারণ তারও পেছনে কারণ আছে বইকি।

ভোলা এলো এর মধ্যে চা নিয়ে। পেছনে ঠাকুর আসে প্লেটে সেঁকা রুটি নিয়ে।

বাসন্তী দেবী বলে উঠলেন, আজকাল কি নেশার মাত্রা বেশী হচ্ছে নাকি ঠাকুর, বেলার হুঁস নেই। নে সুচি, রুটি গুলোতে মাখন লাগা। এই বলে বাসন্তী হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

—মার কি হয়েছে বলতো ছোড়দি? সকাল থেকে কি রকম তিরিক্ষি মেজাজ, মিষ্টার সোম কি কাল আসেননি নাকি। সুচিত্রা রুটিতে মাখন লাগাতে লাগাতে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলো বিচিত্রার দিকে!

বিচিত্রা চোখ পাকিয়ে বললে, সিলি! সুচি, তুমি তোমার লিমিট ছাড়িও না।

—তাই নাকি, কিন্তু তুমিই তো দুদিন আগে বলেছিলে, মা নাকি দিন-দিন মিষ্টার সোমের ভক্ত হয়ে উঠছেন!

—রট্! বিচিত্রা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে বলে উঠলো।

—গাল দিও না বলছি, ভাল হবে না, সব বলে দেবো, তুমি—

—সুচি।—কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল বিচিত্রা।

—কি হয়েছে, সকালে কুৎসিৎ চিৎকার করছো কেন, বলে-বলেও কি তোমরা শিখবে না, কতবার বলেছি চিৎকার করে কথা বলবে না।

বিচিত্রা নির্জীব হয়ে গেল। ফণা ও গুটিয়ে ফেলেছে। সুচিত্রা একটু ফোড়ন কেটে বলল, চা পেটে পড়েনি কিনা তাই ছোড়দির মেজাজটা—

—তুমি থাম, দিন-দিন ফাজিল হয়ে উঠছো। যাক্ রেণ্ট, সান্যাল নটায় আসবে, তুমি যেন পাড়া বেড়াতে বেরিও না।

—আমি কি পারবো মা, এ সব কোনদিন শিখিনি, মাত্র কিছুদিন হলো তো নাচের স্কুলে যাচ্ছি।

—ঠিক পারবে, এ রকম একটা সুযোগ নষ্ট করে না, ডানস্ ড্রামা তায় আবার এম্পায়ারের মত জায়গায়—তাছাড়া রেণ্টু বললে তোমায় কয়েকটা দিন রিয়েসাল দিলেই তুমি ঠিক পারবে।

—রেণ্টুবাবু লোক কিন্তু ভাল নয় মা, সেদিন রাস্তায় এমন করে তাকাচ্ছিল—।

—বাজে কথা বকছো কেন, মানুষ মানুষের দিকে তাকাবে না।

—ঠিক কথা মা, সুচি আজকাল বড্ড বেশী কথা বলছে, এটা ঠিক নয়।—বিচিত্রা গম্ভীরভাবে বলল একচুমুক চা খেয়ে।

—সত্যিই সুচি, বেশী কথা বলছো আজকাল, মেপে মেপে কথা বলা উচিত, তা নৈলে বদনাম রটতে পারে। বাসন্তী বললেন চায়ে চুমুক দিয়ে।

দিব্যেন্দু তার মাকে দেখছিলো: এই তার মা! কি কুৎসিৎ! প্রৌঢ়া নারীর কোন সুষমাই নেই তার মার মুখে চোখে। বয়সকে ঢেকে রাখার কি অদম্য বাসনা! বাবাকে মনে পড়ে গেল। কি পবিত্র, শ্রদ্ধেয়, মুখশ্রী, আর তার মা—সস্তা, ঠুনকো মর্য্যাদা আর বিকৃত লালসাকে সযত্নে লালন করছে।

মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। ভোরের সেই ভাল-লাগার রেশটুকু নষ্ট হয়ে গেল। কি করে প্রাণ খুলে কথা বলবে এদের সঙ্গে—কিছুক্ষণ আগের সঙ্কল্প ভেঙ্গে গেছে দিব্যেন্দুর। ও মাথা নীচু করে বসে থাকে।

দিব্যেন্দুর মত চিত্রা চুপচাপ বসেছিলো। আজকাল ওর কেমন যেন ভাল লাগে না এই আবহাওয়াটাকে। কিন্তু তবু ও রেহাই পায় না। বাসন্তী দেবীর কথা মত চলতে হয়। এখনি হয়ত কিছু ফরমাস করবে যা তার ভাল লাগবে না। তবু করতে হবে।

বাসন্তী দুচার চুমুক চা খেয়ে আর একটু চা ঢেলে নিলেন। তারপর চিত্রাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমিও ঠিক থেকো, গানের রিয়েসর্ালটা আজ তো ?

চিত্রা মুখ না তুলে বললে, হ্যাঁ সন্ধ্যেবেলায়।

—ও, কিন্তু আমি তো যেতে পারবো না, মিষ্টার সোম আসবেন, তা রেণ্টুকেই বলে দেবো।

—না, আমি একাই যাবোখন।

—বেশ তাই যেও। বিচিত্রা, তোর কলেজ কটায়—এগারোটায় ?

—হ্যাঁ, কিন্তু আজ আর কলেজ যাবো না মা, একটু কাজ আছে !

—কি কাজ শুনি ?

—একটু দরকার আছে। বিচিত্রা টেবিলে নখ দিয়ে আঁচড় কাটে।

সুচিত্রা মুচকি হাসে বিচিত্রার দিকে চেয়ে।

—খুব যদি দরকার না থাকে তো কলেজ কামাই করো না।

বাসন্তী আর বেশী জেরা করলেন না। কি দরকার তা বোঝেন তিনি। এ স্বাধীনতা না দিলে ক্ষতি তাঁরই, বেশী জোর করলে

তাঁর ব্যক্তিত্বের ভিত ভাঙ্গবে। যেমন করে ছেলেরা ভেঙ্গেছে।

তো দিব্যেন্দু! একটা কথা শুনছে—দিনদিন নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু আজ যে হঠাৎ খাবার ঘরে সকলের সঙ্গে বসেছে। কিছু বলবে নাকি তাঁকে? বাসন্তী তাকালেন দিব্যেন্দুর দিকে। দেখলেন ওকে খুঁতিয়ে: সত্যি কত ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে। যেন অনেক ঘুরেছে। মনটা হঠাৎ একটু নড়ে ওঠে। বেদনার শিরশিরানি। ভাল ছেলেটা নষ্ট হয়ে গেল—আক্ষেপ শেষে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন খুব আস্তে করে সকলের অজ্ঞান্তে, তারপর খুব মৃদু মোলায়েম সুরে দিব্যেন্দুর দিকে চেয়ে বললেন, দিবু চুপচাপ কেন রে?

দিব্যেন্দু মার দিকে তাকালো, তারপব ম্লান হেসে বলল, এমনি।

—তোর তো পরীক্ষা এসে গেল, ফি জমা কবে দিতে হবে রে? সময়মত বলিস, হাতে টাকা থাকতে থাকতে।

—পরীক্ষা তো দেবো না এবার।

এবার বাসন্তী ভ্রূ কোঁচকালেন: কেন শুনি?

—এমনি, ভাল লাগছে না। এই বলে হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

—এটা কি ভাল হচ্ছে, শুধুমুধু বছরটা নষ্ট করা কি উচিত।

দিব্যেন্দু মাকে কিছুক্ষণ দেখলো। তারপর মুখে হাসির রেশ টেনে বলল, উচিত কি অনুচিত, ভাল কি মন্দ, ভেবে দেখিনি, ভাল লাগছে না তাই দেবো না।

—পার্কে পার্কে হৈ হৈ করতে তো খুব ভাল লাগে।—তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন বাসন্তী।

দিব্যেন্দু এবার বাসন্তীর কথার জবাব দিলো না। ভোলা ঘরে ঢুকছিলো, তার দিকে তাকিয়ে দিব্যেন্দু বলল, বাবার জলখাবারটা দিয়েছিস্ ?

ভোলা জিব কাটলো। তারপর বলল, না ছোটবাবু এখনও তো—এই যাচ্ছি এখুনি—ও ঠাকুর, ব্যস্ততার ভঙ্গিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ভোলা।

হঠাৎ চুপচাপ হয়ে যায় সবাই। দিব্যেন্দু তার মার দিকে চাইলো: কেমন পাংশু দেখাচ্ছে মাকে হঠাৎ, বাবার কথা ওঠার জন্যেই বোধ হয়।

—এমনিই বোধহয় চলছে আজকাল। দেখ মা, তোমার ঐ 'ভালর' বিচারটা ঠিক নয়, তাছাড়া একপেশে দৃষ্টি নিয়ে তো সব জিনিষ ঠিক দেখা যায় না, তোমার দৃষ্টিটা একপেশে হয়ে যাচ্ছে।—দিব্যেন্দু বলল মার দিকে চেয়ে চাপা গম্ভীর স্বরে।

—বাবার দিকে একটু লক্ষ্য রাখিস নারে চিত্রা। চিত্রার দিকে চেয়ে এই কাতরোক্তি করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

চিত্রা চেয়ে থাকলো দিব্যেন্দুর চলে যাওয়ার দিকে। ছোড়দাকে ভাল লাগলো অনেক বেশী আজ। মনে মনে ঠিক করলে, বাবাকে দেখবে সে। সত্যিই তো বাবাকে তো কেউ দেখে না।

—দেখলি বিচিত্রা, আমাকে কেমন অপমান করলে, মা বলে একটু সম্মান করে না হতভাগা। বাসন্তী ফুঁপিয়ে উঠে টেবিলে মাথা রাখলেন।

—ছোটলোকের সঙ্গে মিশেমিশে ছোটলোক হয়ে গেছে, কথা বল কেন ছোড়দার সঙ্গে। আমাকেও কি রকম অসভ্য ভাষায় সম্বোধন করলে। বিচিত্রা মাকে সান্ত্বনা দেয়।

বাসন্তী মুখ তুললেন। সাবধানে চোখে আঁচল বুলিয়ে দিব্যেন্দু-প্রসঙ্গ মুছে ফেলে বললেন, ওর কথা ছেড়ে দে। ওটা একদম নষ্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কি বলেছিলাম, ও মনে পড়েছে, দেখ বিচিত্রা, কাল একবার শঙ্করকে গাড়ীটা নিয়ে আসতে বলিস তো, আমি একটু চৌরঙ্গী যাবো।

বিচিত্রা একটু রাঙলো শঙ্করের নাম শুনে। ও বললে, কখন বলবো আসতে ?

—তিন চারটে নাগাদ।

—আচ্ছা। পা নাচাতে নাচাতে মৃদুস্বরে বলল বিচিত্রা। মনে ওর অন্য চিন্তা এসে গেছে বাসন্তীর মুখে শঙ্করের কথা শুনে। মা হয়ত কিছু জিনিষ কিনবে কাল, কিন্তু তারও যে কিছু কিনতে হবে। নিদেন পক্ষে পঞ্চাশ টাকা—বেংগল ষ্টোর্স'এ যে শাড়ী সেদিন ইরা কিনলো, ওটা তার চাই—শঙ্করের সঙ্গে গেলেই হবে। বড় দরাজ ওর মন। একটু মিষ্টি করে কাছ ঘেঁসে বসলেই ও গলে যায়! কিন্তু বড় ক্যাড ও। দিনদিন মুটিয়ে যাচ্ছে। তা হোক। বন্ধু-বান্ধব দেখলে বলবে, পিসতুতো ভাই, মস্ত কারবার। ললিতাকে একদিন বলেওছে। মা যদি কিছু কেনে কিনুক, কিন্তু শাড়ীটা চাই। ইরা কলেজে কাল পরে এসেছিল, মানিয়েছিল না ছাই। যেমন চেহারা, খালি টাকার জোরেই অত চাল মেরে নাম কেনা—গুছিয়ে কথা বলতেই জানেনা। কলেজ এ্যানুয়ালের সেক্রেটারী হয়েছে। ঠোঁট কামড়ায় আক্রোশে বিচিত্রা।

—আমি উঠি, দেখি রান্নার ব্যবস্থা করিগে। স্থচি, রেণ্টু বোধহয় একটু বাদেই আসবে, খেয়াল থাকে যেন। এই বলে বেরিয়ে গেলেন বাসন্তী।

চিত্রা উঠে দাঁড়ালো। ওর ভাল লাগছে না আর এখানে। একটু একা থাকতে ইচ্ছে করছে। একা একা ভাববে ও।

—মেজদি, তোর সেই জংলা শাড়ীটা দিবি, পরে যাবো ওটা।—স্থচি বলল। সবে স্কার্ট ছেড়েছে ও; শাড়ীর ওপর লোভ ওর প্রচুর। নিত্য নতুন শাড়ী পরতে চায় স্থচিত্রা।

—চ, নিয়ে আসবি।—চিত্রা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। স্থচিত্রাও উঠলো। বসে থাকলো বিচিত্রা। আরো একটু চা খাবে সে, ঝিমুনিটা যাচ্ছে না। কেটলির ঢাকনাটা খুললে—না,

—গরম করা দরকার। ভোলাকে ডাকলো ও দরজার কাছে গিয়ে। তারপর চেয়ারে এসে বসলো শরীরটাকে আলগা করে: আজ দুপুরে সমরেশের সঙ্গে দেখা করার কথা, অনেক করে অনুরোধ করেছে, দুটো নাগাদ গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে। কথাও দিয়েছে সে। যৌবন উন্মেষের সন্ধিক্ষণে সমরেশের সংগে প্রথম আলাপ। আর সেই আলাপ ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ছোড়দার বন্ধু। ছোড়দার সঙ্গে আসতো তখন সমরেশ—রোগা ফর্সা চেহারার ছেলেটি, মুখে চোখে কেমন একটা কোমল ব্যথার রেশ মাখানো থাকতো—বিচিত্রারও মায়া লাগতো। আলাপ হলো এই চা খাবার ঘরে। এত ভাল লাগতো ওকে তখন বিচিত্রার, একদিন সমরেশ না এলে খেতে পারতো না, ছট্‌ফট করতো বিছানায়।

কিন্তু আজ একদিন কেন, মাসের পর মাস না এলে মনে এতটুকু ব্যথার কাঁপন জাগেনা। যত না-আসে ততই ভাল লাগে—কি দিতে পারে সমরেশ তাকে—শুধু দারিদ্র্য আর কতকগুলি মিষ্টি কথার ফুলঝুরি। এ জীবন-বিলাস বিচিত্রার নেই। তাই মার দোহাই দিয়ে এ বাড়িতে আসতে বারণ করে দিয়েছে। কিন্তু তবু ঐ নেকা ছেলেটা ছাড়ে কই। কলেজের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে মাঝে-মাঝে দেখার জন্যে। কাল সে এনগেজমেণ্ট করেছে, সিনেমা দেখাবে। না, এ অসহ্য হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট বলে দোব তাকে দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া উচিত নয়—সিদ্ধান্ত করার পর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল বিচিত্রা।

কিন্তু ওর মুখে-চোখের ব্যাথার রেখাটি বড় ভাল লাগে যে। স্পষ্ট রূঢ় কিছু বলতে পারা যায় না ওকে দেখলে। না, আজ বলতেই হবে। আলাপী বন্ধুর মত মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ হতে পারে, কিন্তু তার বেশী আর কিছু নয়। প্রেম যদি আনন্দ-সুখ-বিলাস না দিলো তবে কেন আঁকড়ে থাকা। দারিদ্র্যকে পাথেয় করে প্রেমের স্বপ্ন-বিলাসে ভাসতে সে রাজী নয় সমরেশের মত। মহৎ প্রাণ হয়ত থাকতে পারে সমরেশের, কিন্তু আজকের দিনে বাঁচতে গেলে চাই টাকা। ভাল ভাবে বাঁচতে গেলে চাই অনেক অনেক টাকা—যা ঐ শঙ্করের মত লোকেদের আছে। টাকার জন্যে সব কিছু সহ্য করতে পারে সে—চার বছরের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্তই সে করেছে। চার বছর ধরে কঠোর বাস্তব একটার পর একটা আঘাত দিয়ে তার সব আশা আকাঙ্খা গুঁড়ো করেছে। মনের মত বাড়তি একটা শাড়ির জন্যে

বইয়ের জন্যে প্রসাধনের সামগ্রীর জন্যে মাকে কত খোসামোদ করেছে সে রোজ-রোজ—কিন্তু সে পেয়েছে কি? গঞ্জনা। আর পেয়েছে ঐ পথের ইঙ্গিত—নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নাও, বাধা দেব না।

সংস্কার, নীতি, সমাজ-ভীতির সঙ্গে মনের লড়াই চলেছে এ ক'বছর; মনে মনে নিজেকে ছি-ছি করেছে। নীচতার আশ্রয়ে উপকরণ সংগ্রহ করার কথা কল্পনা করার জন্যে। কিন্তু আজ সে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, আর নীচ মনে হয় না। আজ ওদেরই বেশী নীচ বলে মনে হয়—ঐ সমরেশ, চিত্রা, দিব্যেন্দুকে—যারা সমাজ, নীতি, আদর্শ থেকে চ্যুত হবে বলে জীবনকে ভোগ করতে পিছিয়ে পড়ে। ওদের থেকে মা অনেক ভাল। যে ভাবেই হোক ভোগের মধ্যে আছে, সামাজিক ঠাট বজায় রেখে চলেছে। রাতে আজও পাকা চুল কলপ করেন, মিষ্টার সোমের সঙ্গে বেড়াতে বের হন, ফিনফিনে অর্গাণ্ডীর জামা আর পাড়বিহীন রেয়ন শাড়ী পরেন, ঈষৎ গোল মুখের চামড়ায় ভ্যাসলীং স্নোর শেষে ফেস পাউডারের কোলে ঘন রুজের আভা দেখা যায়—সব লক্ষ্য করে বিচিত্রা। এক-এক সময় ঘৃণা হয় তারও মাকে দেখলে। নিজের সৃষ্ট সন্তানদের বঞ্চিত করে ভোগ করার বাসনা যে মার মনের মধ্যে নিয়ত জাল বোনে—তাকে ঘৃণা করবে না সে! সে চিনেছে তার মাকে। হয়ত ওরা মার স্বরূপ দেখতে পায়নি। সেদিন যে শাড়ী কিনলো মা নিজের জন্যে, দাম নিদেন পক্ষে দু'শ, কেউ লক্ষ্য করলে না, কোথা থেকে এলো, কত দাম—গোপনে গোপনে কত নোংরামী হচ্ছে সে ছাড়া আর কেউ জানে? জানার চেষ্টাও নেই। কেন থাকবে—চিন্তা করতেও ভয়

পায় ওরা এ-সব। সে ভয় পায় না। কারণ সেও যে ঐ মায়ের মত। বিচিত্রা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল বেশ জোরে।

—এই বিয়াত্রিচে, আর সব কই, চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে তোমাদের? দোহারা লম্বা উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ লোকটি ঘরে ঢুকে বললে সুরেল কণ্ঠে।

বিচিত্রা একটু চমকে উঠলো। তারপর মুখ ফিরিয়ে লোকটাকে দেখে এক ঝলক হাসি উপচিয়ে দিয়ে বললে, মেজদা তুমি! আমি ভেবেছিলাম, আর কেউ। কখন এলে?

—আর কেউ, তোরও আছে না কি রে! বাবা, এই আর কেউ-এর জন্যেই কাল কি না বিপদ।—শিবেন্দু একটা চেয়ার টেনে বসলো।

—ব্যাপার কি, তুমিতো কাল মজিলপুর না কোথায় বরযাত্রী গেছলে? সন্তোষবাবুর না বিয়ে ছিল কাল?

—বলছি বলছি, আগে একটু চা খাওয়া দেখি। ঐতো রুটি রয়েছে। দে, দে, ক্ষিদেয় পেটের নাড়ী টন টন করছে—বল না ভোলাকে একটু করে আনতে। এই বলে শিবেন্দু বেশ ব্যস্ততার সঙ্গে রুটিতে মাখন লাগাতে লাগলো।

—বলেছিতো আগেই, তুমি বল ব্যাপারটকি?

এক কামড় মাখনশুদ্ধ রুটি মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে শিবেন্দু বললে, বিয়ে হলো না সন্তোষটার।

—কেন? আঃ তুমি বড় চেপে রেখে কথা বল মেজদা! আব্দারের সুরে বললে বিচিত্রা।

—তা না হলে গল্প জমবে কেন। শিবেন্দু মরিচের শিশি

হাতে নিলো, তারপর বললে, এত করে করে বোঝালাম, শুনলে না কথা, এমনটা হবেই জানতাম। এই বলে ও রুটিতে মরিচ ছড়িয়ে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে কামড় দিলো।

ঠিক এই সময় ভোলা এলো চা নিয়ে। বেশ একটু জোরের সঙ্গেই বলে সে, আর চা চাইলে চা দিতে পারবো না, ঠাকুর ভাত চড়িয়েছে, বেশী করেই এনেছি।—এই বলে কেটলিটা নামিয়ে রেখে চলে গেল কি বিড়বিড় করতে করতে।

বিচিত্রা দুটো কাপেতে লিকার ঢালতে ঢালতে বলল, এবার বল ভণিতা না করে।

—বরকে নিয়ে তো পৌছলাম সন্ধ্যের পর রাত আটটা নাগাদ। বেশ হৈ হৈ করছি, সন্তোষকে ঠাট্টা তামাসা করছি, হঠাৎ একটি কালো করে মাঝারি রকম লোক এলো, বেশ বিনয় করে বলে, এবার আপনারা যদি অনুমতি করেন তো বরকে নিয়ে যাই। এই বলে শিবেন্দু চায়ে চুমুক দিলো। তারপর আবার বললে, অনুমান করলাম কন্যার পিতা হবেন ভদ্রলোকটি—আমাদের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত কেরাণী সমাজের বহু-সন্তানের পিতারই একজন প্রতিনিধি। সে যাক্, আমরা তো সবাই হৈ হৈ করে অনুমতি দিলাম আর সঙ্গে সঙ্গে বরের পেছু পেছু ছাঁতনাতলায় এসে হাজির হলাম। নানা রংয়ের মেয়েরা উলু আর শাঁখ বাজাতে বাজাতে এগিয়ে এলো। তারপর স্ত্রী-আচার না কি তাও সুসম্পন্ন হলো—এবার কনে আসবে, আমরা প্রতীক্ষা করছি; কিন্তু কনে আর আসে না। কনে নিয়ে এসো, কনে নিয়ে এসো—চারদিক থেকে উচ্চরব ওঠে। কিন্তু কনে আর

আসে না। আস্তে আস্তে কেমন যেন নিঝুম হয়ে গেল। ফিস্‌ফিসানি, কানাকানি কিছু কিছু কানে এলো—তারপর হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ বুক-চেরা কান্না শুনলাম। আমরা চঞ্চল হয়ে উঠলাম, দু'একজন অন্দরের দিকেও গেল। তারপর তারা ফিরে এসে বললে, আর কি এবার চল, বিয়ে আর হবে না! এই বলে শিবেন্দু চুপ করে চা খেতে লাগলো।

—কেন হবে না? বিচিত্রা আগ্রহসূচক কণ্ঠে প্রশ্ন করল। বেশ খানিক কৌতুহল ওর মুখে-চোখে ফুটে উঠেছে।

—না হবার কারণ তো সেই চিরাচরিত। সমাজ-নীতির ভয়ে পালিয়ে গেছে জীবন ছেড়ে—আত্মহত্যা করেছে মেয়েটি। কারণ যৌবন-ধর্মের তাগিদে পাড়ার একটি ছেলেকে ভাল বেসেছিলো, আর তারই উত্তাপ তাকে সমাজ-নীতি-সংস্কারের কাঠগড়ার আসামী করে তুলেছিলো! জানা গেল মেয়েটি অন্তঃসত্বা। তাই কালি মাখবার ভয়ে পালিয়ে গেছে।—বলতে বলতে শিবেন্দু একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, যা ও সাধারণতঃ হয় না।

বিচিত্রা একটু কেঁপে উঠেছিলো। কিন্তু কেন? ভয়ে কি—না, না ভয় সে করে না, অত ভীতু সে নয়।

—সত্যি মেয়েটা কি বোকা, জীবনটা নষ্ট করে ফেললে—এই রূপ-রস-গন্ধভরা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল—বাঁচার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করলো নিজেকে। আমি হলে বাঁচতে চাইতাম, যদি সমাজ নোংরা জায়গায় ঠেলে দিতো—তাহলেও বাঁচতুম। বেঁচে থাকাইতো লাভ, মরে গেলেইতো সব ফুরিয়ে গেল, তাই নয় কি রে বিচিত্রা?

বিচিত্রা কথা বললে না, ঘাড় নেড়ে জানালো, হ্যাঁ তাই-ই। মন ওর অন্য কথা বললে, বাঁচতে সে চাইবে, কিন্তু দারিদ্র্যের মধ্যে নয়—ঐ অবস্থায় আত্মহত্যা নিশ্চয় করতো না, তবে নীচ অবস্থার মধ্যেও নেবে যেতো না, ছলে বলে কৌশলে, যে কোন পদ্ধতিতে হোক নিজেকে যথাস্থানে স্থাপনা করতোই।

—যাক্ ও সব, তুই যে একা একা বসে—আর সবাই কোথায় ?

—আজ যে একটু গরম ব্যাপার হলো। মানে, ছোড়দা আজ চা খেতে এসেছিলো। বিচিত্রা রসিয়ে বলল।

—তাই নাকি, তা Unsocial Socialistটি বিপ্লব-বহ্নি দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন সকলকে !

—না সকলকে আর কোথায়, টারগেট শুধু ছিলুম আমি আর মা! সত্যি মেজদা, ছোড়দাটা দিন-দিন যা হচ্ছে,—কথা বলতেই ইচ্ছে করে না! মুখটা বিকৃত করে উঠলো বিচিত্রা।

—সে কিরে, নিজের দাদা হয় যে। কোনদিন আবার আমায় বলবি, তুমি একটা স্নব, তোমার সঙ্গে আবার কি কথা বলবো।—হো হো করে উচ্চ হাসি হাসলো শিবেন্দু।

—তোমার সব তাতেই ঠাট্টা; কোন কিছুই সিরিয়াসলি নেবে না।

—তোরা নিচ্ছিস, উপকার পাচ্ছিস কিছু? আমার মতে সিরিয়াস না হয়ে সহজ হওয়াই ভাল, তা ভায়া কি বললে ?

—বলবে আর কি, ভাল'র বোধ ওনার একলার।

—ও এই ব্যাপার, আমি ভাবছিলাম আরো অনেক কিছু,

তা ভালোর বোধতো ওর আছেই, এটা বলতে পারে সে। কারণ সবাই সে কথা বলে—শিবেন্দু একটা সিগারেট ধরালো। তারপর বেশ মউজ করে সিগারেটায় টান দিয়ে বল্লে, যাক্ ও সব কথা, মা কোথায় রে ?

—বোধহয় রান্নাঘরে।

—যাই একটা সুখবর দিয়ে আসি, এই বলে শিবেন্দু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

—কি সুখবর মেজদা—উৎসুক হয়ে তাকালো শিবেন্দুর দিকে।

—মার খরচটা একটু বেঁচে গেল রে—হাসলো একটু শিবেন্দু।

—কি রকম, মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলো বিচিত্রা।

—মানে একটা টিউশ্যানী পেয়েছি। তা হাত খরচার টাকা আর জামা কাপড়ের খরচা মাকে উপস্থিত দিতে হবে না।

—ও এই ব্যাপার, আমি ভাবলাম তুমি একটা বড় কিছু পেয়ে গেছো—মুখ বেঁকালো বিচিত্রা।

—বড় কিছু! ভদ্রলোকদের ছোট কিছু পাবার উপায় নেই, আবার বড়। দেখ বিচিত্রা, আজকের দিনে সৎ উপায়ে বড় কিছু হওয়া মানে মাষ্টার হওয়া। আমি এতেই সন্তুষ্ট, তবে তোদের উপকরণ-প্রধান সভ্যতায় এই ভাবে কতদিন টিকে থাকবো বলতে পারিনে। যাই মাকে খবরটা দিই, তবুতো আড্ডাধারী নামটা আংশিক ঘুচবে, কি বলিস—উচ্চ হেসে বেরিয়ে গেল শিবেন্দু।

—একটা ভাইও মনের মত নয়—মনে মনে গুমরতে থাকলো বিচিত্রা—বড়দা, একরকম নিজের স্বার্থ নিয়েই আছে।

আর ছোড়দা—সে বিলোচ্ছে নিজেকে। রাবিশ, এই ছোড়দাকে মোটেই দেখতে পারে না। মেজদা অনেক ভাল। সম্বন্ধ ভালই রাখতে জানে ও—কিন্তু ছোড়দাটা একেবারে আনকুথ. অসহ্য! না, এবার উঠতে হবে, চান করতে হবে। তারপর একটু বেরুবে সে। মণিকাকে বইগুলো দিয়ে আসতে হবে— একটা আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ালো বিচিত্রা।

দিব্যেন্দু সকালের চা'টেবিলের তিক্ত মনকে নিয়ে ছটফট্ করছিলো একা একা ঘরে বসে। একটা বই টেনে নিয়েছিলো। কিন্তু কিছুই ভাল লাগছে না। একবার ভাবলো, বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু এই সকালে কোথায় যাবে—সবাই ব্যস্ত। কেউ শুনবে না, কেউ বুঝবে না তাকে।

—আচ্ছা অশোকের বাড়ী গেলে কেমন হয়? অশোক হয়ত বেরিয়ে গেছে, অশোকের মা পূজায় বসেছেন। নবানী হয়ত স্নান সেরে কুঠনো কুটছে। কি অন্য কোন কাজ করছে, গুনগুন করে গান করতে করতে—বেশ লাগছে ভাবতে ওদের কথা। বাড়ীটা বেশ। সবাই কেমন প্রাণবন্ত।

—ছোড়দা আছো নাকি—চিত্রা ঘরে ঢুকলো।

—কে রে, ও চিত্রা, আয় বোস—দিব্যেন্দু একটু নড়ে চড়ে বসলো।

চিত্রা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। তারপর বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায় ওদের নীরবে। চিত্রা ছোড়দার ঘরটাকে লক্ষ্য করে দেখছিলো, অগোছালো সবকিছু, ঠিক

ছোড়দারই মত। কেউ আসে না এ ঘরে। সেও তো অনেক দিন বাদে এলো। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চিত্রা হঠাৎ বললে, নবানীদের বাড়ীতে যাও না ছোড়দা ?

—কেন রে—উৎসুক হয়ে চাইলো দিব্যেন্দু।

—অনেক দিন খবর পাইনি ওর।

—গেছলুম দু'দিন আগে, ভাল আছে। তোর কথা বলছিলো কত।

—কি বলছিলো ?

—অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ করিস নি তাই বলছিলো, চিত্রা বোধ হয় ভুলে গেছে।

—চিত্রা হাসলো একটু আলতো করে, তারপর বললে, আমিও বলতে পারি সে কথা। আগে তবু অশোকদা আসতো তোমার কাছে, খবর পেতুম, আজকাল তিনিও তো আসেন না, অশোকদা কেমন আছে ?

—ভালই আছে অশোক, তবে আজকাল নতুন এক্সপেরিমেণ্ট করছে, খায় এক বেলা তাও ফলাহার, কি পূজো গীতা পাঠ করে রাতে—সকালে কালিঘাটে যায়—ওটা একটা আস্ত পাগোল। —তাই নাকি—অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠলো চিত্রা।

—হঠাৎ যে কে বিগড়ে দিলে মাথাটা ওর, ওর মা'তো ভয় পেয়ে গেছে, আমায় সে দিন বলছিলেন, দেখো বাবা অশোককে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওর মতি ফেরাও, কে'জানে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে কতক্ষণ।

—আমায় আজ একটু নিয়ে যাবে ওদের বাড়ী ছোড়দা ? একটু অধীরতার সুরে বলল চিত্রা।

—বেশতো চ-না, কখন যাবি ?

—যখন তোমার সময় হবে, চিত্রা বললে।

—বেশ তাহলে দুপুরে চ।

—নবানীর কলেজ না দুপুরে ?

—ও হ্যাঁ তাইতো, তাহলে বিকেলে চ, আমি একটু বেরুবো, ঘুরে আসতে দেড়টা দুটো হবে,—তা বিকেলেই নিয়ে যাবো কি বলিস ?

—সেই ভালো, এই বলে উঠে দাঁড়ালো চিত্রা—কেমন যেন অবশ লাগছে দেহটা, কোন জোর পাচ্ছে না আর মনে—আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল চিত্রা।

আশোক আর নবানী ভারি অদ্ভুত ওরা। অশোক ধীর গম্ভীর চাপা আর নবানী ঠিক উল্টো; ঝর ঝরে ঝর্ণার মত উচ্ছল ও—বড় ভাল লাগে ওকে দিব্যেন্দুর।

বছর দশেক আগে আট বছরের একটা ফুটফুটে মেয়ে—ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল নাচাতে নাচাতে আসতো এ বাড়ীতে। বাগানে লুকোচুরি খেলতো, নবানী অশোক চিত্রা আর সে—কি ভালোই লাগতো। মা কত বোকতো—কে শোনে তখন—হ্যাঁ নবানী চোর হলে তাকে ছুঁতো না। সেও ছুঁতো না নবানীকে চোর হলে। আবছা আবছা মনে পড়ে দিব্যেন্দুর। বেশ লাগছে ওর ছোট বেলার স্মৃতি রোমন্থন করতে—তারপর নবানী আসতো পড়তে—একসঙ্গে পড়তো সে অশোক আর চিত্রা আর নবানী। নবানীর মা, মাকে কতোদিন বলেছে, মনে পড়ে গেল দিব্যেন্দুর—এত ভাব

দাদি এদের, এক সঙ্গে ছাড়া থাকতে পারে না, তা বিয়ে দিয়েই দাও। মনে আছে, মা গম্ভীর হয়ে যেতেন। নবানীর মাকে বলতেন চল আমরা ও ঘরে বসি—মা বোধ হয় পছন্দ করতো না তাদের এই মেলা মেশা—কে জানে! পরে কি একটা কারণে মার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হলো। তারপর থেকে নবানীর মা আর আসতেন না এ বাড়ীতে। শুধু ভবানীপুর চলে যাবার সময় দেখা করতে এসেছিলেন মা আর বাবার সঙ্গে—ভা'রী ভালো মানুষ কিন্তু মাসিমা। আজও যেন কত আপন। মার মত কাছে টেনে নেন, ধমকান, আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন —আর নিজের মা—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল দিব্যেন্দু—না না আর ভাবনা নয়।

এবার বেরুতে হবে—একবার শ্যামবাজার যেতে হবে, খগেনদা টাকাটা দেবে বলেছে। সেখান থেকে পার্টি অফিস। তারপর ইউনিভার্সিটিতে একবার—না দেরী নয়—দিব্যেন্দু একটা ঝাঁকি দিয়ে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

দিব্যেন্দু ট্রামের জন্যে দাঁড়িয়েছিলো রাস্তার মোড়টায়। বেলা আর কত, পৌনে নটা। এরই মধ্যে ট্রামে ওঠার জায়গা নেই—কত লোক কলকাতায়—দিব্যেন্দু বিরক্ত হয়ে ওঠে। ১৯৫০ সাল। হাজার হাজার লোক! বাস্তুহারা—কায়েমী সংসার ভেঙ্গে গেছে। কংগ্রেস সরকার, পাকিস্থান সরকার—দুই সরকারের মধ্যে পড়ে চিড়ে চেপটা মানুষ! রসকশ শুকিয়েছে! লড়াই—ধর্মে, মতের, স্বার্থের, নেতৃত্বের—শালা লেড়ে, বজ্জাত, মারো—শালা

ক্ষাফের ভাগো।—শিশু সরকারের কাছ থেকে কিছু চেও না—দাও সময়। আরো খাওয়া কমাও—ফসল বাড়াও। বাদাম খোল খাও—অনেক ভিটামিন। বেরিবেরি, ডিস্পেপসিয়া, কলেরা, প্লেগ, সরষের তেলে আরো তিসি আরো আরজিমন মেশাও আর দুবেলা গোউ খাওয়াও, গঙ্গা স্নান করো, নীতি-দুর্নীতি আর হবে না—বাঁচতেই হবে, যেমন করেই হোক, সকলকে বঞ্চিত করেও। হ্যাঁ তাকেও—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল দিব্যেন্দু। মাত্র পাঁচ বছর—কি হয়ে গেল!

কেন ভাবছে সে! কি দরকার ভাববার? নিজের খাওয়াপরা আর সব সুখ হলেই তো হয়। একটু চেষ্টা করলেইতো সব ঠিক ব্যবস্থা হয়। কি করে হবে, কেমন করে! ঐ বাড়ীর মধ্যে? এই সমাজে! দম বন্ধ হয়ে যাবে যে—যাক্ এই ট্রামটায়, হাতল ধরে এক ঝাঁকি দিয়ে উঠে পড়লো দিব্যেন্দু সব ভাবনাকে পেছুনে ফেলে।

—আরো দিব্যেন্দু যে, কি মনে করে এই সকালে।—খগেন রায় তার ঘেরা চেয়ারটা একবার ঘুরিয়ে বললে।

খগেন রায় মাত্র আট বছরে কয়েক লাখ টাকা করেছে—দিব্বি চেহারাটা হয়েছে, মোটা সোটা নাদুস নুদুস।

—এই এলাম আপনার পাওনাটা মানে তুমি তো বলেছিলে আসতে, সঙ্কোচে কথা বন্ধ হয়ে যায় দিব্যেন্দুর!

—ও পার্টির চাঁদা, যেমন দাদা তেমনি ভাই, একজন কবি আর একজন রাজনীতিবিদ—এতো বলি এ সব ছেড়ে দাও আখেরের কিছু কর তা শোনেকে। তা দাদার খবর কি?

—ভালোই আছে।

—দাদাকে বলোতো দেখা করতে। আর আজতো কিছু দিতে পারবো না ভাই, আর একদিন এস, দেখ, চাঁদা তুলে দেশের ভাল কিছু হয় না। আচ্ছা তোমাদের এখন কাজ কি? কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে লোকদের ক্ষেপিয়ে তোলাতো—কিন্তু তাতে কি দেশের কি কিছু ভাল হবে?

দিব্যেন্দুর কোন কথা বলতে ইচ্ছে হলো না ঐ লোকটার সঙ্গে। ভাল লাগছে না ওর পিট-চাপড়ানো কথাবার্তা। তবু বললে, ভাল হবে বলেই তো জানি, পাঁচ জন ভাল থাকবে বাকী সব তাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকবে এটাতো যাবে, আর কিছু যাক আর না যাক্। তোমরাতো নিজেদের গণ্ডীর স্বার্থের কথা ভেবেই-ভাল মন্দর বিচার করো, তা সেই বিচারে খারাপ বইকি—চিবিয়ে চিবিয়ে বললো দিব্যেন্দু শেষের কথাগুলো।

—তা না হয় বুঝলাম হে, যে তোমরা যা চাইছো তাতে সবার ভালো হবে। কিন্তু উপস্থিত যা করে তোমরা এগুচ্ছো সেটা কি ঠিক ভাল নাকি! দেশের লোকদের খাবার থাকার ব্যবস্থা না করে শুধু পেছুনে কাঠি দিলেই কি সব ঠিক হয়ে যাবে! এই যে হাজার হাজার রেফুইজি আসছে, কাশ্মীর হাত ছাড়ার মত, পাকিস্তান হুমকি দিচ্ছে—এই সব সমস্যা সমাধানে কি তোমাদের দায়িত্ব নেই—শুধু দালাল সরকার বলে দুটো পট্‌কা ছুঁড়লেই দায়িত্ব খালাস হলো নাকি? বলো না, আসর জমাতে চাইলেন খগেন রায়। আজ একটু সময় আছে হাতে তার।

দিব্যেন্দুর ইচ্ছে হচ্ছিলো, ঠাস করে একটা চাপড় দেয় খগেন রায়ের গালে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, দেখ খগেনদা, সমস্যা ইচ্ছে করেই করেছে তোমাদের সরকার, কি দরকার ছিলো ভাগাভাগি মেনে নেবার, তা হলে রায়ট্ হতো না, হাজার হাজার লোকের প্রাণহানি হতো না, গুটি কয়েক লোকের স্বার্থের জন্যে ওরা এই সমস্যাকে টেনে এনেছে। আমাদেরকে নীচ করে তুলেছে, জীবনকে তেঁতো করে তুলেছে নিজের কাছে—যাক, এসব ভালোমন্দর তর্কের শেষ হবে না, কারণ তুমি বায়াস্, এই বলে দিব্যেন্দু উঠে দাঁড়ালো। আর ভাল লাগছে না এখানে।

হো হো করে হেসে উঠলো খগেন রায়—কি বললে, আমি বায়াস, তা বেশ, কিন্তু তুমি উঠলে যে! একটু চা খেয়ে যাও।

—না থাক্, অনেক কাজ আছে চলি এখন।

—তাহলে শিবুকে দেখা করতে বলো কিন্তু, ভুলো না কেমন।

—আচ্ছা, এই বলে আর দাঁড়ালো না দিব্যেন্দু। বেরিয়ে পড়লো। অনর্থক মাথাটা গরম হয়ে গেল—কি লাভ হলো! বাজে, খালি কথার লড়াই। শুধু কি তাই—খগেনদার স্বরূপতো জানা গেল—এই সেই খগেন রায়! যে তাকে স্বদেশী করতে প্ররোচিত করেছিলো, হ্যাঁ প্ররোচিতই বইকি! কি জানতো সে তখন, আর ভালোলাগত কি শুনতে! কিন্তু খগেনদা নাছোড়-বান্দা, শেষ পর্য্যন্ত তাকে টেনে নিয়ে এসেছিলো এই রাজ-নীতির বাজারে। কত বড় বড় কথা—আদর্শর জন্যে, দেশের জন্যে, মানুষের জন্যে জীবন পণ করেছি আমরা! আর আজ গবর্ণমেণ্ট কনট্রাক্টর খগেন রায় বলেন, দেশের জন্যে, মানুষের জন্যে, আদর্শের

জন্যে করে কি হবে! নিজের আখের দেখো, চাও-তো একটা সব কনট্রাক্টটারী দিতেও পারবো—নীচ অপদার্থ কোথাকার—থুতু ফেললো দিব্যেন্দু রাগে।

—কি মশাই দেখতে পান না নাকি, বেমালুম গায়ে লাগলো যে থুতুটা—নেশা করেছেন নাকি এই সকালে।

দিব্যেন্দু হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর লজ্জিত হয়ে বললো, কিছু মনে করবেন না, খেয়ালের মাথায়—

—ও সব খেয়াল-টেয়াল বাড়ীতে বসে করবেন, রাস্তা আরো পাঁচ পাবলিকের জায়গা, বুঝলেন, মুখ সিটকিয়ে রোগা কালো লোকটা হলদে চোখ দুটোকে বড় করলো।

দিব্যেন্দু চুপ করে এগিয়ে গেল আর কথা না বাড়িয়ে। বাস ধরতে হবে, বেলা অনেক হলো। পার্টি অফিস হয়ে বাড়ী।

—আরে, দিব্যেন্দু বাবু যে, কোথায় চলেছেন—রোগা লম্বা ফ্যাকাসে একটি মেয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলো।

আবার দাঁড়াতে হলো—আরে মিস বোস যে, তারপর কি খবর—তবু যা হোক দলের মেয়ে। খুসী হলো দিব্যেন্দু।

—চলুন না ঐ চায়ের দোকানে, বোধহয় চা পাওয়া যাবে, বড় তেষ্টা পেয়েছে, বসে কথা কওয়া যাবে।

—চলুন, কিন্তু আমার যে, আচ্ছা চলুনতো, এই বলে দিব্যেন্দু চলতে সুরু করে।

ঘেরাটোপে ঢুকে এক গেলাস জল খেয়ে মিস বোস বললেন, খবর কি! কাজটাজ কি রকম চলছে?

—ভালই, কিন্তু আপনি খবর রাখেন না নাকি, অনেক দিন দেখিনিও!

বয় চা দিয়ে গেল দু কাপ—আর কিছু দেবো কেক, মামলেট ?

—খাবেন নাকি কিছু, দিব্যেন্দু জিজ্ঞেস করে।

—কেক্ খেতে পারি।

বয় চলে গেল। মিস বোস বললেন, কি করে দেখবেন বলুন, পাকিস্থান থেকে মা, বাবা ছোট ভাইবোনগুলো এসে পড়েছে, রোজগার কম, দাদা আমি যা রোজগার করি তাতে কি চলে, তাই আরো খাটতে হচ্ছে। তাই আর যেতে পারি না। মনও চায় না, সত্যি দিব্যেন্দু বাবু, কি সব হয়ে গেল রাতারাতি স্বাধীন হয়ে, সব আশা ভরসা নষ্ট হয়ে গেছে, ক্লান্ত স্বরে বললেন মিস বোস্।

দিব্যেন্দু এবার লক্ষ্য করলো মিস বোসকে—সত্যি, বেচারী বোঝার ভারে নুয়ে পড়েছে। চোখ দুটোর কোলে কালি পড়েছে, কপালের শিরা ফুলে উঠেছে, মুখের লালিত্য চলে গেছে। আছে শুধু কাঠামোখানা, অর্থ-যন্ত্রের চাকায় সব খুয়িয়েছে মিস বোস, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলালো দিব্যেন্দু।

—উপায় কি বলুন, এরই মধ্যে পথ করে নিতে হবে।

বয় কেক্ দিয়ে গেল।

কই কেক্ খান, মিস বোস খেতে খেতে বললো।

ম্লান হেসে দিব্যেন্দু বললো, ভাল লাগছে না, আপনি ওটা নিন না।

—তা না হয় নিচ্ছি, কিন্তু শুধু চা, শরীরটাতো ভাল দেখছি না, অসুখ টসুখ কিছু—!

—না, এমনি চান করিনি বলে রুক্ষ দেখাচ্ছে, দিব্যেন্দু চায়ে চুমুখ দিলো। আর এক খানা কেক্ হাতে নিলেন মিস বোস।

দিব্যেন্দু মিস বোসের ব্যস্তভাবে খাওয়াটা দেখছিলো, বেচারীর বড় ক্ষিদে পেয়েছে, হয়ত পয়সা নেই কাছে।

—আপনাদের ওপর ভরসা, আপনারা কাজ করে যান, তাহলেই হবে, এবার চায়ে চুমুক দিলেন মিস বোস।

খাওয়া শেষে দাম চুকিয়ে বাইরে এসে দিব্যেন্দু মিস বোসকে বললো, আসবেন না মাঝে মাঝে পার্টি অফিসে।

—চেষ্টা করবো, কিন্তু কথা দিতে পাচ্ছি না, আচ্ছা চলি আজ, বড় ভাল লাগলো আপনাকে—কেমন একটা অপরিচিত হাসি হেসে মিস বোস চলে গেলেন। দেখলো দিব্যেন্দু। এ-কি হাসি! এমন হাসি দেখেনি দিব্যেন্দু কোন দিন। চেষ্টা করে কায়দার হাসি। বড় কুৎসিত কদর্য লাগলো দেখতে। হয়ত ঐ হাসির মত কদর্য মিস বোসের ভেতরটা। কে জানে, যাক্‌গে মরুগে মিস বোস, ওতো আর ফিরবে না। কখোনই না, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কালো অণিমা বোস ফুরিয়ে গেছে ঐ খগেনদারই মত, সব এক জাতের, বিশ্বাস করবে সে কি করে মানুষ কে, মাথার মধ্যে আবার রাশ রাশ কথা বিড় বিড় করতে থাকে দিব্যেন্দুর—

কীটের মত সব কিল বিল করছে, একে ওকে গিলচে মারছে চট্ ফট্ করছে, আর রাশ রাশ খালি ধোঁয়া, না, না, এ অসহ্য পাগোল হয়ে যাবে সে, কিন্তু রেহাই কই!

বাস এলো সামনে। অন্যমনস্ক ভাবেই উঠে পড়ল দিব্যেন্দু। কোথায় যাচ্ছে বাসটা, সে কোথায় যাবে, কোন কিছু খেয়াল নেই ওর।

—এই যে দিব্যেন্দু, এত দেরী যে! এসো বসো, কথা আছে. এই বলে একটি রোগা গোছের লোক ওকে আলাদা বসালো।

দিব্যেন্দু চমকালো—আরে পার্টি অফিস যে! সত্যিই খেয়াল করেনিও, পার্টী অফিস এলো না আর কোথাও।

—তারপর কমরেড খেয়াল আছে কিছু, শ্যেন দৃষ্টিতে চাইলো লোকটি।

—ও হরি, তোমার তাও খেয়াল নেই! যাক্ তাহলে মনে করিয়েই দিই। আর সাত দিন বাদেই প্রভিনসিয়াল ইলেকশান. কিছু ভেবেছো কি?

—কি ভাববো আবার, যারা ভাল চালাচ্ছে. তারাই ইলেকটেড হবে, এতে ভাববার কি আছে!

লোকটি একটু চুপ করে থেকে দিব্যেন্দুকে লক্ষ্য করলো তারপর বললো. দেখো, তা যদি হতো তাহলে তো কথাই ছিলো না। কিন্তু যে সব ক্লিক চলছে. তাতে ভাল এবং এফিসিয়েণ্ট লোক নেতৃত্ব নিতেই পারবে না। লিডারসিপ নিয়েইতো যত গোল। তাই আমাদের উচিত যাতে ভালো লোক কমিটিতে যায় তার ব্যবস্থা করা।

দিব্যেন্দু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো। সেই নোংরামি।

—গত বছরের কথা মনে আছে। তুমিও কি কম খেটেছিলে কিন্তু ওরাতে ভোটে জিতে গেল। এবার হয়ত চেষ্টা সফল হবে, আমি বা আমার সব ঠিক আছে, শুধু তোমার ছাত্র ফ্রণ্টে একটু খাটলেই সব ঠিক হয়ে যাবে. দেখ আর কিন্তু সময় নেই। তাড়াতাড়ি বোঝানোর ব্যবস্থা কর।

দিব্যেন্দু চুপ করে শুনলো কথাগুলো। কিন্তু কোন জোর পাচ্ছে না মনে। গত বার প্রচুর খেটেছিলো, কিন্তু এবার—ভালো লাগছে না। কি হবে এ সব করে! এরা গেলেও তো সেই ক্লিক, রেষারেষি থাকবে। তবে কেন শুধু শুধু নংরামি করা।

—কই বল, কি করবে, আর কেউ, মানে নিখিলেশকে সঙ্গে নেবে?

—এবার আর আমার দ্বারা হবে না কিঙ্কর, আমি ছুটি নেবো কিছুদিন। তা লিখিলেশকেই বলো না।

—কি হয়েছে হে তোমার? এত মোরোজ্ এত মরবিড কেন?

—এমনি শরীর একটু খারাপ যাচ্ছে, এড়াবার জন্যে বললো দিব্যেন্দু।

—কিন্তু তুমি হলেই ভালো হতো, যাক উঠি আমি, এই বলে কিঙ্কর উঠে দাঁড়ালো। আর দিব্যেন্দুর সঙ্গে সময় নষ্ট করার মত সময় নেই।

আদর্শ এখানে বড় নয়, বড় নেতৃত্ব। মানুষের কল্যাণ করা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হলো, কল্যাণ করার নামে তাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, দিব্যেন্দু উঠে পড়লো—না এখানে আর নয়। শুধু সেক্রেটারীর সঙ্গে একবার দেখা করে বলতে হবে, অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে ছুটি চাই।

বেলা তখন দুটো। দিব্যেন্দু ট্রাম থেকে নেমে বাড়ীর দিকে একটু এগুতেই লক্ষ্য করলো, একটা গাছের তলায় সমরেশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। হয়ত তাকে খুঁজতে এসেছিলো, কি অন্য কিছু কাজে, এগিয়ে গেল ও সমরেশের কাছে।

—কি খবর রে, এখানে দাঁড়িয়ে ?

চমকে গেল সমরেশ। তারপর দিবোন্দুর দিকে বোকা বোকা চাহনিতে চাইলো।

একটু আশ্চর্য্য হলো দিবোন্দু সমরেশের হাব-ভাব দেখে। তবু সহজ করে হেসে বললে, কি ভাবছিস. আমার কাছে এসেছিলি বুঝি ?

—হ্যাঁ, না মানে, জড়তা এসে থামিয়ে দিলো সমরেশকে।

—তারপর দেখা সাক্ষাৎ নেই কেন ? ‍ সিস না মাঝে মাঝে, কোথায় যাচ্ছিস, বাড়িতে চ-না, খেয়ে দেয়ে একটু আড্ডা মারা যাবে।

—না ভাই একটু দরকার মানে কাজ আছে। আসবোখন সময় করে। তা তুই তো যেতে পারিস। আমাদের ওখানে যাস না কেন ? তোর আবার সময় হওয়াই মুস্কিল, লিডার লোক, বোকার মত হাসলো সমরেশ।

—ও অজুহাত নেই অবশ্য, তবে বিশেষ কোথাও যাই না আজ কাল, তুই আসিস না। নতুন কিছু লিখেছিস নাকি ? নিয়ে আসিস না।

—আচ্ছা আসবো। আজ চলি কেমন। একটু তাড়াতাড়ি আছে।

দিব্যেন্দুকে আর কিছু বলার অবকাশই দিলো না সমরেশ। ব্যস্ত হয়ে চলে গেল।

দিব্যেন্দু দাঁড়িয়ে রইলো ওর যাওয়ার দিকে চেয়ে—অদ্ভুত মানুষের প্রকৃতি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে বসে থাকতো তার

সঙ্গে গল্প করার লোভে, সেই এড়িয়ে যেতে চায়! হয়ত কাজ সত্যিই আছে, কিন্তু তার একটা আলাদা ধরণতো আছে। এ রকম অপ্রকৃতিস্থ, অসংলগ্ন ব্যবহার—খাপছাড়া লাগলো দিব্যেন্দুর।

—যাকগে, আর ভাল লাগে এই ছাই পাঁশ ভাবতে, বড় ক্লান্তি লাগছে, বিছানায় গা মেলতে পারলে ভাল নয়, দিব্যেন্দু একটা জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে এগিয়ে গেল রাস্তার দিকে।

বাড়ীটা নিঝুম। আয়েসের প্রলেপ লাগানো। কোথাও সাড়া নেই। ঠাকুর-চাকরও দিবানিদ্রায় মগ্ন। খাবার ঘরের দিকে আর গেল না, আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দিকে এগোতে লাগলো দিব্যেন্দু। ঠিক এই সময় দোতলার সিঁড়ি থেকে খুট খুট জুতোর আওয়াজ। দিব্যেন্দু সিঁড়ির দিকে তাকালো, বিচিত্রা নামছে, ফিনফিনে জমকালো বেশে—চোখ ধাঁধিয়ে যায়, মনের মদ উপচিয়ে ওঠে। দিব্যেন্দুর পাশ দিয়ে চলে যায় বিচিত্রা, ওকে অপরিচিতের মত উপেক্ষা করে। দিব্যেন্দু কিছু করল না, কিছু বলল না, ও নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

দিব্যেন্দু চলে গেলে আবার এগিয়ে এলো সমরেশ। পুষ্পশরে জর্জরিত। উৎকন্ঠিত হয়ে নীড়ের দিকে চেয়ে থাকে—জীবনের আর সবের কোন হিসেব-কষা নেই। শুধু একটি নারী কি বললে, কি করলে, কতটুকু হাসলে, কতটুকু তাকে গ্রহণ করলে, কি না করলে—তারই চিহ্ন সমরেশের মনের কোনে।

প্রক্ষোভের তীব্র রেশ শিরায় শিরায় পাক দিয়ে বেড়াচ্ছে— কখন আসবে সে, কখন হেসে হেসে বলবে, একটুখানি দেরী হলো, চল এবার, সময় নেই মোটেই।

ঐ দূরে বিচিত্রা আসছে, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। যেন খুসির ঝরণা—আঃ কি দুষ্টু ওর নাবিকনীল শাড়ীর আঁচোলটা, খালি সরে যাচ্ছে ওকে লজ্জায় ফেলে—সমরেশ মোমের মত গলতে থাকে।

বিচিত্রা এগিয়ে এলো সমরেশের কাছে। তারপর বললে, রোদে দাঁড়িয়ে তো রাঙা হয়ে উঠেছো, ছায়াতে দাঁড়াতে পারোনি, কতক্ষণ এসেছো?

বেশীক্ষণ আর কোথায়, এইতো কিছুক্ষণ, কিন্তু তোমায় আজ যা সুন্দর দেখাচ্ছে—গদগদ হয়ে উঠলো সমরেশ।

নিজের রূপস্তব ভালই লাগলো বিচিত্রার। তবু উদাসীনতার ভাণে আলতো করে সমরেশকে ছুঁয়ে বললে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বললে কিন্তু ওদিকে দেরীই হবে।

—ও হ্যাঁ তাইতো, তা চল ট্র্যামে উঠি, না ট্যাক্সি ডাকবো? অর্থহিসাবের সময় নয় এটা। সমরেশ ভুলে গেছে অর্থ কত দুর্মূল্য তার জীবনে।

—ট্র্যামে, নাক সিটকোয় বিচিত্রা—না ট্যাক্সিতেই, চল একটু এগিয়ে যাই। এগিয়ে গেল ওরা দুজনে।

Weekdaysএর ম্যাটিনী—রিয়ার ষ্টল বেশ খালি খালি। আবছা আলো অন্ধকারে লাইটহাউস! ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। নরম নরম গদি। বাইরের সব ভুলিয়ে দেয়

ছবি দেখান স্থরু হয়েছে। সমরেশ বিচিত্রার কাঁধে কাঁধ ঠেসিয়ে বসলো। তারপর বিচিত্রার একটা হাতে মৃদু চাপ দিলো। আলো আঁধারে ঠাণ্ডা পরিবেশে বিচিত্রার ভাল লাগছে সমরেশের হাতে ঐ চাপটুকু। ও চাইলো সমরেশের দিকে। মুখে অনুমতির অস্পষ্ট হাসি। সমরেশ আরো ঘন হয়ে বিচিত্রার কাণের কাছে মুখটা এনে বললে, আমাকে কষ্ট দেবে না তো আর।

বিচিত্রা আলতো স্বরে বললে, কষ্ট কি ইচ্ছে করেই দিই তোমায়, কেন বুঝতে পারো না আমায়।

—বুঝি সব, কিন্তু মন যে শুনতে চায় না। লক্ষীটি, বলো মাঝে মাঝে আসবে সিনেমায় ?

বিচিত্রা তার কাঁধটা সমরেশের কাঁধের কাছে হেলিয়ে দিয়ে বললে, আসবো, কিন্তু আর বেশী কিছু নয়, বাড়ীতে জানতে পারলে—

—না গো না, তোমাকে মাঝে মাঝে দেখতে পেলে কিছুই চাইবো না। তুমি জানো না, আমি রাতে ঘুমোতে পারি না, কাজ করতে পারি না।

চাপা গলায় সান্ত্বনা দিলো বিচিত্রা, জানি, তুমি যে খুব ভালোবাস আমায়।

ছবির দিকে খেয়াল নেই ওদের। ছবি এগিয়ে যাচ্ছে এক একটা ঘটনা ঘটিয়ে পরিণতির দিকে।

সমরেশ কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। ও কখনও বিচিত্রার হাতে চাপ দেয়, হাত বুলিয়ে দেয়, আবার কখনো ঘেঁসে বসে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে চুলের গন্ধ নেয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু মিটছে না যেন।

বিচিত্রা আরাম পায়। সারা দেহ কেমন শির শির করে। সেও সমরেশের হাত চেপে ধরে চোখ বোঝে।

—ভালো লাগে না, বল-না ভাল লাগে কি-না—আবদারে মুখের কাছে মুখ নিয়ে যায় সমরেশ।

—ভালো খুব ভালো তুমি,—দুষ্টুমি. করো না লক্ষীটি। ছবি দেখো। এই-এই আর কেউ দেখবে যে, বিচিত্রার স্বর মিলিয়ে যায়। কেউ দেখবে কি না কে জানে। কিন্তু তাতে কি বাধা শুনবে এই জোয়ার।

—অনেকগুলো কবিতা লিখেছি বিচিত্রা।

—তাই না-কি, একটু নড়ে চড়ে বসলো বিচিত্রা।

—শুনবে, চলনা একদিন বোটানিকে. গাছতলায় তোমাতে আমাতে আর কবিতা, কেমন সুন্দর বলতো!

—বেশতো যাওয়া যাবে। কিন্তু আর কথা নয়, ছবিটা দেখি এবার। দেখ না কি চমৎকার ট্যাব নাচছে, এই বলে বিচিত্রা পর্দ্দার দিকে চাইলো।

—ট্যাব নাচছে একটি মেয়ে আর একটি ছেলে। বেশ সাবলীল ছন্দে। বিচিত্রা পায়ে শব্দ করে তালে তালে। ভাল লাগে তার এই বিলিতী নাচ। সমরেশের ভাল লাগে না এই ঘোড়ার মত টক টক শব্দ আর নাচ। তবু দেখার চেষ্টা করে ও, বিচিত্রার ভাল লাগে যে।

দুপুর গড়িয়ে এসেছে। "নীড়ে" পড়ন্ত রোদ ঝলমল করছে। পাখীগুলো গাছে বসে ডাক দিয়ে বৈতালিককে স্বাগত করছে, জানালা দিয়ে অলস চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো দিবেন্দু।

কেমন যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে সে। সেই দুপুরে ঘুরে এসেই শুয়ে আছে। ওঠেনি এখনও। কেউ আসেনি তার কাছে। কেউ খেতেও ডাকেনি। শুয়ে শুয়ে অনেক কিছুই ভেবেছে। কিন্তু কিছুইতো মনে নেই এখন। এখন শুধু বাগানের পড়ন্ত রোদ আর পাখীগুলোর ডাক বেলা শেষের ইঙ্গিত জানাচ্ছে—এই কথাই মনে হচ্ছে। সত্যিই হয়ত তারও বেলা শেষ হয়েছে। কি মূল্য আছে আর জীবনের! কতটুকু লাভ হবে সে বেঁচে থাকলে—মুখ ঢাকলো বালিসে, ভেতর থেকে কান্না বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে দিব্যেন্দুর।

নীড়ের গেট পার হয়ে একটা মোটর এসে দাঁড়ালো। দিব্যেন্দুর জানালার একটু আগে হর্ণ বাজলো তীব্র স্বরে। দিব্যেন্দু দেখলো মুখ তুলে—বেঁটে একটা লোক। নতুন দেখছে সে—কেন এলো কে জানে! কৌতুহল নেই জানার তার।

—মাসিমা। অদ্ভুত সরু তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর—দিব্যেন্দুর কাণে এসে লাগে।

—কে শঙ্কর নাকি! বস যাচ্ছি, ভোলা ও ভোলা—মার ব্যস্ত কণ্ঠস্বর।

মার পরিচিত কেউ হয়ত। কিন্তু আগেতো দেখিনি—কি ভাবছে সে! কেন কি দরকার তার! কানে যে আসে! চোখে যে দেখতে হয়—দিব্যেন্দু বিছানা থেকে উঠে পায়চারি করে বেড়ায় ঘরময়। বাইরে চুপচাপ।

—এই যে বাবা, একটু চৌরঙ্গী যাব বলেই ডেকে পাঠিয়ে ছিলুম। বিচিত্রাতো বেরিয়েছে, চা খাবে একটু? বাসন্তী বললেন।

—চা, না থাক্, চলুন তো এখন। চা না হয় চৌরঙ্গীতে খাওয়া যাবে।

—বেশ তাই হবে. তাহলে একটু অপেক্ষা কর বাবা. এখুনি আসছি।

আবার চুপচাপ।

লোকটা বড়লোক তাহলে. তাতে তার কি? মা ওর সঙ্গে চৌরঙ্গী যাচ্ছে কেন? একলাইতো যেতে পারতো! মোটরে করে যাবে, পাঁচ জন দেখবে. মনে মনে একটা আত্ম-প্রসাদ! হাসি পেলো দিব্যেন্দুর।

আবার আওয়াজ আসছে কাণে. খুট খুঁট জুতোর শব্দ, শিস্, একটা গন্ধও নাকে এলো—ভালো সিগারেট নিশ্চয়।

—চল বাবা আমার হয়ে গেছে. বেশ খুসীর ভাব মার স্বরে।

—চলুন।

জুতোর আওয়াজ কানে এলো দিব্যেন্দুর। তারপর গাড়ীর দরজা বন্ধ হলো। ষ্টার্টের শব্দ—গাড়ীটা বেরিয়ে গেল।

যাক পাপ বিদায় হলো—স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো দিব্যেন্দু। তবু কি রকম যেন মনে হয় দিব্যেন্দুর—জীবনে কোথা থেকে হঠাৎ কি ঘটনা ঘটে, তারপর মন বল, জীবন বল, সব কিছু কেমন বদলে যায়। এই মাকে ছোটবেলা কত ভালো লাগতো. আয়াটা দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে, তবু বারে বারে মার কাছে এসেছি, জ্বালাতন করেছি, কত ভালো ছিল তখন, সত্যি—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো দিব্যেন্দু।

—ছোড়দা চা খেয়েছো, একি, চান করনি, খাওনি বোধ হয়—চিত্রা এলো ঘরের মধ্যে।

দিব্যেন্দু চিত্রার দিকে চেয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। তারপর বললে, হ্যাঁরে চিত্রা, আমি কি খুব বদলে গেছি ?

চিত্রা একটু আশ্চর্য্য হয় দিব্যেন্দুর কথা শুনে—কি ভাবছে ছোড়দা ? কে জানে। ও বললে, এমন কি বোদলেছো, উদাস তুমি বরাবর, কথাও তুমি কম বলো, আছোতো তাই। থাকগে, কিছু কি খাবে তুমি, খাওয়া যে হয়নি বুঝতেই পাচ্ছি, আমাকে তো ডাকলে পারতে।

দিব্যেন্দু ম্লান হেসে বললে, খেতে ইচ্ছে নেই তাই খাইনি রে, তা চা নিয়ে আয়. ঐ সঙ্গে পাউরুটি থাকেতো নিয়ে আসিস।

—আনছি, কিন্তু যাবে তো নবানীদের ওখানে—জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে চিত্রা।

—হ্যাঁ তাইতো রে, একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম, তা, চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ি, কি বলিস ?

—হ্যাঁ তাই চল, আমি এখুনি আসছি তোমার চা নিয়ে, এই বলে চিত্রা বেরিয়ে যায় দিব্যেন্দুর ঘর থেকে বেশ ব্যস্ত ভাবে।

চিত্রার যেন কি হয়েছে আজ। সারা দুপুর ধরে অকারণ বুকের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। চোখ ছাপিয়ে জল এসে যাচ্ছে। আর বারবার অশোকদার সেই হাসি হাসি মুখখানা মনে পড়ছে—কি সুন্দর মানায় ওকে গিলে করা সাদা পাঞ্জাবী আর দিশী ধুতিতে ! বাবু বললে চটে যেতো অশোকদা—ফর্সা কিছু পরলেই তোমার কাছে বাবু হয়ে যাবো, এবার থেকে লেংটি পরতে হবে দেখছি—মনে পড়ে যায় চিত্রার ছোট ছোট টুকরো টুকরো ঘটনাগুলোকে। এখন নাকি সাধু হয়ে যাচ্ছেন—চিত্রার ইচ্ছে করে অশোকদার পা দুটো জড়িয়ে বলে, না, না, এ তুমি কি

করছো, এ আমার সহ্য হবে না। কিন্তু কি করে বলবে! তার মনের কথা মনেই তো রয়ে গেছে, ব্যক্ত হয়নি—হয়ত হবে না।

চা তৈয়ারী করতে করতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো চিত্রা।

—কিরে চা করছিস নাকি? শিবেন্দু খাবার ঘরে ঢুকে বললো।

—হ্যাঁ, তুমি খাবে তো?

—খাবো না কিরে, চা অমৃত! কিন্তু বাঙ্গালিনী, তোমার চোখ কেন ভিজে ভিজে, কি হয়েছেরে?

—কই, কিছু হয়নি তো—চিত্রা আঁচলটা দিয়ে চোখ দুটো পুঁছে নিলো।

একটা চিয়ারে বসে শিবেন্দু বললে, সবাই পাল্টাচ্ছে কিন্তু তুই তো তেমনটি রইলি, না তোর আর উন্নতি হলোনা, নেহাত সেকেলে রয়ে গেলি, বাড়ীর আর সব বুঝি বেরিয়েছেন?

চিত্রা ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ খালি ছোড়দা আছে।

—ও, দে চা-টা খেয়ে আমিও বেরোই, আড্ডা মারতে যেতে হবে সেই শ্যামবাজার।

—এই নাও, আমি এটা বাবাকে দিয়ে আসি।

—তথাস্তু, হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা তুলে নিলো শিবেন্দু।

চিত্রা বেরিয়ে এসে দিব্যেন্দুর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বললে, ছোড়দা তুমি খাবার ঘরে গিয়ে খেয়ে এস, আমি বাবাকে চাটা দিয়ে আসি।

—তাই যাচ্ছি।

চিত্রা চলে গেল লাইব্রেরী ঘরের দিকে।

দিব্যেন্দু খাবার ঘরে এসে শিবেন্দুকে দেখে একটু আড়ষ্ট হয়ে বসলো। মেজদার কথাকে বড় ভয় করে তার। কি বলে বসবে, ও ঘাড় নিচু করে চা ঢেলে নিলো।

শিবেন্দু সিগারেটে মৃদু টান দিতে দিতে দিব্যেন্দুকে লক্ষ্য করছিল—Poor child, আক্ষেপের স্তুপ একটা, জীবনটা নষ্ট করে ফেললে—মনের মধ্যে কেমন একটা বেদনা অনুভব করে শিবেন্দু ছোট ভাইটার জন্যে। কি যে চাই ওর নিজেই জানে না।

—তারপর ছোটবাবু, কি রকম চলছে কাজকর্ম !

দিব্যেন্দু চায়ের কাপটা আড়াল করে বললে, ভালই, হ্যাঁ, তোমাকে খগেনদা দেখা করতে বলেছে।

—খগেন, তোর সঙ্গে দেখা হলো কোথায়, চাঁদা তুলতে গেছলি নাকি ওর কাছে ?

দিব্যেন্দু ঘাড় নাড়লো।

—দিয়েছে কিছু, নিশ্চর নয়।

—না দেয়নি, আর যা হয়েছে আজকাল খগেনদা।

—লোক চিনলে না ভায়া, বিপ্লব করার স্বপ্ন দেখো, বলিহারী তোমাদের প্রচেষ্টা !

দিব্যেন্দু কোন কথা বলল না। ও জানে দাদাকে, কথা বললেই তাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে।

—দেখ দিবু, তোরা মুখে থিয়রী আওড়াবি, লোকের কাছে মুখস্ত বলে যাবি, এই তোদের কাজ। সহজ বুদ্ধি তোদের কিন্তু কারো নেই। লোক চিনে, মানে অবস্থা দেখে ব্যবস্থা করার মত বুদ্ধি তোদের সবার অভাব, তা নৈলে দেশের এই অবস্থা হয়!

ইমোশন আর সেন্টিমেণ্টের ওপর তোদের সবার রাজনীতির সেতু, মুখে বলিস বুদ্ধি আর চেতনার ওপর ভিত গাড়ছিস, কাজে সেন্টিমেণ্ট তোদেরও গলিয়ে দেয়।

এবারও কোন কথা বললো না দিব্যেন্দু। চিত্রা এমনি সময় ঘরে ঢুকলো, বললে, তাড়াতাড়ি নাও ছোড়দা, আমায় আবার গানের রিয়ার্শালে যেতে হবে ওখান থেকে. এই বলে ও নিজের জন্যে একটু চা ঢেলে নিলে।

দিব্যেন্দু চিত্রার কথাতে কোন উত্তর দিলো না। চুপচাপ চা খেতে লাগলো। মনের মধ্যে মেজদার কথাগুলো তাল পাকাতে থাকলো।

—ছেড়ে দে ও সব। কি হবে, দেখবি শেষে এতো দিনের এই ঘুরে মরাই সার। ঐ খগেন, ব্যাটা এককালে কত নীতির আদর্শের কথা বলতো, তখন ছিল তার দৈন্যদশা সব দিক থেকেই, আর যেই একটু সুযোগ পেলো, ব্যাস, রাতারাতি নীতির শ্রাদ্ধ করে ফেললে, তবে পোজ আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছে নিখুঁত-ভাবে। একটা কথা কি জানিস, ঐ খগেন-টগেনের মত লোকই আমাদের সমাজে বেশী, সে বড়লোক গরীব লোক সবার মধ্যেই, এরা পশুর স্তর থেকে এখনও ওঠেনি। এদের শিক্ষা গোড়া থেকে দিতে হবে, নৈলে তোমার ঐ যত বাদই বল না কেন সব বাদ হয়ে যাবে। দে আর একটু চা দে চিত্রা—এই বলে শিবেন্দু সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে ফেলে দিলে।

—শিক্ষাটা তোমার কি রকম শুনি—দিব্যেন্দু প্রশ্ন করলো।

—মোটা কথায় বলতে গেলে, মানুষকে নিজের কাছে স্বাধীন করার শিক্ষা দিতে হবে। বুদ্ধিটা বাড়িয়ে দিতে হবে,

যাতে করে ভাবপ্রবনতাকে দমন করতে পারে বুদ্ধি, তা নৈলে আদিম যুগের মানুষের মত আজকের মানুষ থেকে যাবে। আমার কথা ঠিক নিতে পারবি না তুই, বায়াস হয়ে গেছিস তোরা তোদের চলতি মতের কাছে।

—তর্ক করলে কিন্তু আর যাওয়া হবে না ছোড়দা, চিত্রা বলে উঠলো। ওর ভালো লাগছে না এই কচ্‌কচি। মন ওর চঞ্চল হয়ে রয়েছে অশোকের জন্যে।

—কোথায় যাবি রে?

—নবানীদের বাড়ী।

—ও নবানী, সেই নবানী যে আসতো এ বাড়ীতে, শিবেন্দু বললে চিত্রার দিকে চেয়ে।

—হ্যাঁ সেই।

—অনেক বড় হয়েছে না রে, অনেকদিন দেখিনি, আমাকে সে ভারি ভয় করতো, হেসে বললে শিবেন্দু।

—চল ছোড়দা।

—যাচ্ছি, তুই কাপড় ছেড়ে আয়।

—তুমি কাপড় ছাড়বে না?

—না।

—বেশ, এক্ষুণি আসছি, এই বলে চিত্রা চলে যায়।

—নবানী! বেশ নামটা। মনেই ছিলনা, এককালে পরিচিত ছিলাম—আপম মনে বলে উঠল শিবেন্দু।

—তুমি তাহলে খগেনদার সঙ্গে দেখা করো।

—খগেনের সঙ্গে, ও, আচ্ছা, আজি তো যাচ্ছি ওদিকে—শিবেন্দু হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কি ভাবছে সে!

পিছনের কিছুকে কি ?

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। ওরা দুভাই মুখোমুখি বসে থাকে দুটো দ্বীপের বাসিন্দার মত !

ছোট একতলা বাড়ী নবানীদের। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে পরিচ্ছন্নতায়, ভারি ভাল লাগে দিব্যেন্দুর। এ বাড়ীতে এলে মনটা কেমন যেন পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। গ্লানি থাকে না। কোথা থেকে স্ফূর্ত্তি উপচিয়ে আসে। একটু ছেলেমানুষী করতে ইচ্ছে করে যেন।

—মাসিমা তুমি কোথায়. দেখো কে এসেছে- ডাক দিলো দিব্যেন্দু।

—কে রে, ও দিবু, আরে চিত্রা মা যে, আয়, আয়, কতদিন দেখিনি তোকে !

ঘরের কোলে রোয়াকটায় এসে দাঁড়ালেন মাঝারি ধরণের ফর্সা চেহারার একটি প্রৌঢ়া মহিলা। চওড়া লালপাড় শাড়ী পরণে। সিঁথিতে উজ্জ্বল সিন্দূর। মুখে অদ্ভুত সুষমা। টানা টানা চোখ দুটোয় স্নেহ উপচিয়ে পড়ছে।

চিত্রা এগিয়ে গিয়ে পায়ের ধূলা নিলো।

—থাক, থাক্‌রে. কিন্তু তুই যে বড় রোগা হয়ে গিয়েছিস— চিত্রাকে বুকে টেনে নিলেন মাসীমা।

চিত্রা হাসলো শুধু মাসীমার মুখের দিকে চেয়ে।

—চ ভেতরে চ, আয় দিবু।

—অশোক কোথায় ?

—বাড়ীতেই, ঘরে বসে কি পড়ছে বোধহয়, ঐ এক ছেলে

দেখো না, কি করবে কে জানে,—চিত্রাকে কাছে নিয়ে এগিয়ে গেলেন মাসীমা।

—বাণী ও বাণী কোথায় গেলি।

—এই যে ঘরে মা, কি বলছো? কোণের ঘর থেকে উত্তর এলো!

—কে এসেছে দেখে যা! দালানে শতরঞ্চি পাততে পাততে বললেন বিজয়া দেবী। তারপর চিত্রার দিকে চেয়ে বললেন, তোর মা কেমন আছে রে? দিবুটা নিজেরই খোঁজ রাখে না বলে তো খারাপ কেন থাকতে যাবে, নে বসতো, একটু গল্প করি—হাসলেন বিজয়া দেবী।

—ভালোই আছে মা, বসলো চিত্রা।

—তুই দাঁড়িয়ে রইলি কেন রে, বস একটু। তোরা কি সবাই এমনি করে এড়াতে থাকবি না কি—ছেলেমানুষী যেন, কিছু খোয়াবার তবু কাতরোক্তি মাসিমার স্বরে—লক্ষ্য করে দিব্যেন্দু।

—কি বললে এড়াতে চাই, এই বলে হেসে দিব্যেন্দু বিজয়ার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো।

ঠিক এই সময় নবানী আসে দালানে।

—আরে চিত্রা তুই, কাছে এসে ওকে জড়িয়ে ধরলো নবানী।

—ভাবতেই পারিস নে নয়, বা বেশ সুন্দর হয়েছিস তো, নবানীর দিকে চেয়ে হাসলো চিত্রা আত্মীয়তার হাসি।

—তুই ও কি কম, তবে একটু রোগা হয়ে গেছিস মনে হচ্ছে, একটা গান শোনাবিতো—চাইলো চিত্রার দিকে নবানী।

দিব্যেন্দু মাসিমার কোলে শুয়ে শুয়ে দেখছিলো, কখনো নবানীর মুখের দিকে, কখনো চিত্রার মুখের দিকে—ভারী সুন্দর

হয়েছে নবানী, কি সুন্দর ওর টিকোল নাক, আয়ত চোখ, পাতলা ঠোঁট আর চিবুকটি। আরো একটু লক্ষ্য করলো দিব্যেন্দু, ওর পিঠের আলতো করে বাঁধা কোঁকড়ানো চুলের খোঁপাটাকে—যেমন অনাদৃত আর তেমনি সুন্দর, কাপড় পরেছে, সাধারণ ছাপা শাড়ী। গায়ে সাদা সূক্ষ্ম কাজ করা পাতলা ব্লাউজ. ভেতরের কুচবন্ধ ঢাকা শঙ্খমুখী নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ, পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে—তন্বী নবানীর আবেশ নিদালি লাগায় কেমন যেন দিব্যেন্দুর চোখে। চোখ বোজে ও।

—গান, সে হবে খন. তারপর কেমন আছিস তুই. পড়াশুনা কেমন ?

—ভালই, তুই কলেজ ছেড়েছিস শুনলাম, কেন রে ?

—বন্ধু পেয়ে যে তুই আমাকে ভুলে গেলি চিত্রা ? দেখ দিবু কাণ্ডখানা, বিজয়া দেবী দিব্যেন্দুর মাথার চুলে আঙ্গুল চালাতে চালাতে বললেন।

—উঁ হুঁ, এটা কিন্তু ঠিক নয়. উঠে বসলো দিব্যেন্দু—মাসিমা দেখো, তুমি আমার সঙ্গে চলো, মেয়েগুলোই এমনি হয়। আচ্ছা মাসিমা, তুমি কি রকম পড়াশুনা করছো ?

—পড়াশুনা করবো কি রে, মাসিমা অবাক হলেন। সবাই হেসে উঠলো।

—কিন্তু ক্ষিদে পেয়েছে মাসিমা।

—যাই দেখি অশোক কি করছে, দিব্যেন্দু উঠলো।

—তাই যা না, মাসিমা বললেন।

—তাই যাই আমিও বন্ধুর কাছে, এই বলে দিব্যেন্দু নবানীর দিকে চাইলো।

নবানী দিব্যেন্দুর দিকে চেয়ে একটু হাসলো, তারপর বললে, তোমার বন্ধুটি বোধ হয় কিছু ধ্যান করছেন, কিংবা গীতা পাঠে মশগুল, দেখগে না।

—দেখি, এই বলে দিব্যেন্দু অশোকের ঘরের উদ্দেশ্যে চললো।

দিব্যেন্দু চলে গেলে বিজয়া দেবী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, দুই পাগোল, একজন ভগবান নিয়ে পড়েছে আর এক-জন দেশ নিয়ে পড়েছে, নে মা তোরা গল্প কর, আমি যাই দেখি রান্না ঘরে, উঠে পড়লেন বিজয়া দেবী ভারাক্রান্তা মনে।

বিজয়াদেবী চলে গেলে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে নবানী বললে, চল আমার ঘরে গিয়ে বসি কেমন, ওরাও উঠল।

নবানী তার ঘরে ঢুকে বললে. আসিস না কেন মাঝে মাঝে এখানে. এলেতো পারিস।

—আসবো. কিন্তু আনে কে, একা আসতে পারি, কিন্তু মা'র যা ফরমাশ।

নবনী তার খাটে বসে হেসে বললে. মা বুঝি খুব খাটায়, আমি কিন্তু ভাই দরকার থাকলেই বেরিয়ে পড়ি। দাদা ও রকম হওয়াতে মাতো কিছুই বলে না। বড় বেশী ভালবাসে দাদাকে মা।

চিত্রা নবানীর মুখের দিকে চেয়ে থাকলো। মুখে কিছু বললে না। মন ওর অশোককে দেখতে চাচ্ছে শুধু।

—তুই এত উদাস কেনরে চিত্রা? কি হয়েছে তোর?

—কই কিছু নয় তো, সহজ হবার চেষ্টা করে চিত্রা।

—তোর দাদা কি রকম হয়ে যাচ্ছে আজকাল জানিস চিত্রা, কি যে ভাবে আজকাল ও. এখানে এলে কেমন বিষণ্ণ দেখায়। জিজ্ঞেস করলে কিছু বলবে না। খালি মার কাছে একটু ছেলে-মানুষী করে, কি জানি কি হয়েছে—নবানীর স্বরটা কেমন আস্তে আস্তে নরম হয়ে আসে।

—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, কিছু মনে করবি নাতো, অন্য কিছু ভাবিব নাতো, আগে বল—চিত্রা নবানীর একটা হাত টেনে নিলো

একটু বিস্ময় এলো নবানীর চোখে। ও বললে. বলনা কি জিজ্ঞেস করবি।

—আচ্ছা ছোড়দাকে তুই ভালবাসিস না রে? সত্যি বলবি কিন্তু—উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো চিত্রা।

নবনী চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর ম্লান হেসে বললে, দেখ চিত্রা, তোকে মিথ্যে বলবো না, কাউকে বলিস নে কিন্তু।

—আজকাল আমাকে তাই মনে হয় নাকি রে, নবানীকে জড়িয়ে ধরে বললো চিত্রা।

—না না তা নয়, ওটা কথার কথা বলছিলুম! এই বলে চুপ করলো নবানী।

—তা বল না কি বলতে যাচ্ছিলি, নবানাকে ছেড়ে দিয়ে খাটে হেলান দিয়ে বসলো চিত্রা।

নবানী একবার চিত্রার দিকে চাইলো, তারপর শাড়ীর আঁচলটা ছু'হাতে জড়াতে জড়াতে বললে, তুই জীবনটাকে কি চোখে দেখিস জানিনে, তবে আমি নিজেকে দিয়ে যা বুঝেছি, তাতে

আজকের দিনে প্রেম আর জীবন বোধ হয় এক হতে পারে না। ছোট বেলা থেকে আমার মনে তোর ছোড়দার সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়ে দিয়েছে আমার মা, তোর হয়ত মনে আছে।

চিত্রা ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ মনে আছে, মাসিমা বলতো তোদের বিয়ের কথা।

—ওই কথা মনের মধ্যে গেঁথে গেছলো ছোটবেলা থেকেই। তারপর মাঝেতো কতোদিন ছাড়াছাড়ি, আমি স্কুল থেকে কলেজে গেলুম যখন তখন তোর ছোড়দা আসতো, কিন্তু একটা জিনিষ কি জানিস, ভালবাসি ওকে আমি কিন্তু কামনা করার পথ ও করে দেয়নি—চুপ করল নবানী।

চিত্রা চেয়ে চেয়ে দেখছিলো নবানীকে—এর জীবনটাও কি ব্যর্থ হয়ে গেল নাকি, কে জানে কি হবে!

—আর আজকে তো ও অন্য পথে আর আমি অন্য পথে, নবানী হঠাৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে।

—এক কি হতে পারে না?

—সম্ভাবনা কম, যাক্ ওসব কথা, তোর খবর বল—ম্লান হাসলো নবানী।

—ছোড়দার জীবনটাই কেমন সৃষ্টিছাড়া, বাড়ীর সঙ্গে তো সম্বন্ধই নেই, মা বিচিত্রা, এরাতো ছোড়দাকে দেখতেই পারে না। আদ্দেক দিন খায় না বাড়ীতে। নিজের ভাল মন্দ, কিছুই তাল নেই। খালি এখানে ওখানে ছন্নছাড়ার মত ঘুরছে। দু'বছর বাদে পরীক্ষা দেবে ঠিক করলে, তাওতো শুনছি দেবে না। কি যে চায় ছোড়দা, বুঝতে পারলুম না ভাই।

নবানী চুপ করে শুনলো চিত্রার কথা গুলো। কিছু বললে না। সে কি জানে না দিব্যেন্দুকে—ওর সব কিছুই সে বুঝতে পারে, বাড়ীতে ও টিকতে পারবে না, কেউ দেখে না। সবতো বুঝতে পারে সে, না বললেও। অমন সুন্দর চেহারাটা দিন দিন কালি হয়ে যাচ্ছে। শোনে কি, সেকি বলেনি। বললে হাসে—রাগ ধরে নবানীর। ঐ মানুষকে নিয়ে জীবন বাঁধতে ভরসা কই—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো নবানী।

—দেখ চিত্রা, তোর ছোড়দার জীবন ভোগ করার নয়, আমার বিশ্বাস, ও কোনদিন স্থির হয়ে ঘর বাঁধতে পারবে না, যা আমি চাই।

—ওরে চিত্রা. বলি তোরা কোথায় গেলি, আয় না এ দিকে।

—মা ডাকছে চ চিত্রা, বোধ হয় ময়দা মাখতে হবে, নবানী উঠে দাঁড়ালো।

—চ, চিত্রা উঠে দাঁড়ালো।

—আচ্ছা অশোক, তুই শান্তি পাচ্ছিস এতে—দিব্যেন্দু কম্বলটার ওপর আড় হয়ে শুয়ে বললে।

অশোক টান হয়ে বসেছিলো। সামনে পুরাণটা খোলা রয়েছে, তাতে নিবিষ্ট-ওর চোখ। দিব্যেন্দুর কথা শুনে হেসে বললে, পাই কি না ঠিক বলতে পারি না। তবে পাবার চেষ্টা করছি। দেখ দিবু, সত্য আজ আমি উপলব্ধি করি মনে প্রাণে কিন্তু ব্যক্ত করতে পারিনা। যে দিন ব্যক্ত হবে সে দিনই পাবো পূর্ণ বোধ। আমি বোঝাতে পারবো না, কোন দিন পারবো কি না জানিনে—অশোক চোখ বুজঁলো। কিসের ভাবে বিভোর হয়ে গেছে ও।

দিব্যেন্দু চেয়ে থাকলো ওর দিকে—আজ যদি ওর মত আত্মস্থ হয়ে তন্ময় হতে পারতো। মনের ঝড় যদি শান্ত হতো! দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দিব্যেন্দু বললে, আচ্ছা তার মনে কি মানুষের এই দুঃখ, দারিদ্র্য, জ্বালা-যন্ত্রনা, অতৃপ্তি, কোন কিছুই কি রেখাপাত করে না। তোর সঙ্গে যাদের দৈনন্দিন জীবন জড়িত তারা কি বললে, কি করলে, কি ভাবলে তোর সম্বন্ধে, তুই বা কতটুকু কি ভাবলি, কি করলি, এ সব কোন কনফ্লিক্ট কি আসে না?

অশোক শান্ত স্বরে বললে, ছিল এককালে, তখন ছট্‌ফট্‌ করেছি, দেখেছিস তো, তখন যাচাই করেছি শক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে, বিচার করেছি সব কিছু, তাতে ঘৃণা এসেছে, গ্লানি জমেছে, অতৃপ্তির জ্বালাতে ছট্‌ফট্‌ করেছি ভাই। কিন্তু যে দিন মনকে বিশ্বাসের গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে নিলুম সে দিন যেন নতুন করে জন্ম নিলুম। তারপর তো ওরই বল জুগিয়ে দিলে ভক্তি, তারই জোরে চলেছি ভাই মায়ের কাছে ছোট ছেলের মত—হাসলো মৃদু অশোক।

—আজ কি তোর কোন কিছুর ওপর আসক্তি নেই?

—না নেই। এই বলে অশোক দিবোন্দুর গায়ে হাত রেখে বললে, আমার কথা তো অনেক শুনলি, তোর খবর বল, কি রকম আছিস?

দিব্যেন্দূ অশোকের দিকে চেয়ে হেসে বললে, আমাদের খবর আর কি, সামাজিক জীব, সুতরাং ঐ নোংরামির মধ্যে বাঁচার লড়াই করছি, আর কি।

—তৃপ্তি পাস ?

—তৃপ্তি পাই কি না জানি না, তবে চলেছি।

অশোক হাসলো একটু শুধু দিব্যেন্দুর কথা শুনে। কিছু বললো না।

হাসিটা ভাল লাগে না দিব্যেন্দুর। নিজেকে লুকোচ্ছে—সেটাই ধরে ফেলেছে অশোক। তার ইঙ্গিত ঐ হাসিটা। আর নিজে—ভয়ে পালিয়ে গেছে। ভগবান, সত্য এর মধ্যে শান্তি পাচ্ছেন না ছাই, মিথ্যেবাদী—দিব্যেন্দু অশোকের দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললে, এ সব বাজে, আমার মনে হয় না তুই শান্তি পাস, ছেড়ে দে তোর এসব fetishism, একি! এসব effeminacy কতোদিন থাকবে জানিনে, তোর মত শিক্ষিত এককালে বিপ্লববাদীর এই পূজোটুজো মেয়েলী ব্যাপার উড়িয়ে দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুই নিজে মেয়েলী হয়ে গেলি—দিব্যেন্দুর মন আত্মপ্রসাদে মশগুল হয়ে উঠলো। অনেক বলেছে, আর কি!

অশোক কোন কথা বলে না। আবার সেই হাসি হাসলো।

—না বসতে দেবে না দেখছি, মনটা আবার খিঁচড়ে যায় দিব্যেন্দুর।

—নে পড় তোর পুরাণ-কোরাণ যা খুসি, আমি উঠি, দেখি মাসীমার খাবার কতদূর—সত্যি সত্যিই উঠে পড়লো দিব্যেন্দু।

—আসিস আবার, হেসে বললে অশোক। দিব্যেন্দু শুধু ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কথা বলল না সে আর কোন।

—ভগবান, ওর মনে বিশ্বাস এনে দাও, ভক্তি এনে দাও—চোখ বুজে বিড়বিড় করে বলে উঠল অশোক। তারপর ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ সুর করে পড়তে লাগলো—

দৃঢ় ভক্তি হয় যদি তোমার চরণে।
তবে তো বিমল সুখ হয় মোর মনে ॥
সে সুখের কাছে সব তুচ্ছ করি মানি।
সাষ্টি আর সালোক্য তৃণের তুল্য জানি ॥
সারূপ্য সামীপ্য সাম্য লীনতা এ হয়।
মুক্তি ঐশ্বর্য্য বল কিছুই কিছু নয় ॥

অশোক বিভোর হয়ে গেল। ভক্তিরসে প্লাবিত ওর দেহ, মন, রসনা।

দিব্যেন্দু অশোকের ঘর থেকে সোজা নবানীর ঘরে এসে ঢুকলো। মনটা আবার কি রকম যেন হয়েছে—অশোককে ঐভাবে বলাটা কি ঠিক হলো? কিন্তু ও অবিশ্বাসের হাসি হাসলো কেন, সুস্থ আলোচনা কেন করলে না, সব ফাঁকি, বিশ্বাস করবে কি করে সে—নবানীর খাটে গা এলিয়ে দিলো ও। ঘরে কেউ নেই—কোথায় গেল নবানী? ও, চিত্রার সঙ্গে গল্প করছে কোথাও। আচ্ছা নবানী কি বিশ্বাস করে তাকে অন্তর দিয়ে—আবার এলোমেলো চিন্তা এসে হাজির হলো দিব্যেন্দুর মাথায়। বিশ্বাস-অবিশ্বাস কি এরা নিজেদের স্বার্থের দিকে নজর রেখে করে নাকি! নবানী কি ঐ দলের? না, না কি ভাবছি আমি—ঠোঁট কামড়ায় দিব্যেন্দু—অমন সুন্দর মেয়ের সম্বন্ধে কি ভাবছে! তবু সে কি বিশ্বাসের জোরে তার সঙ্গে ভাসতে পারে?

—তুমি এখানে, দাদার সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা হলো, নবানী ঘরে ঢুকলো। তারপর খাটের একধারে বসলো।

দিব্যেন্দু চেয়ে থাকলো নবানীর দিকে—না, একে অবিশ্বাস

করার কথা কল্পনা করাই অন্যায়। দিব্যেন্দু উঠে বসলো, সিদ্ধান্ত শেষ। তারপর বললে, কি বলছিলে যেন ?

—ও শোনোনি বুঝি, দিন দিন যা হচ্ছো তুমি—স্বরে মিষ্টি রেশ ঢেলে দিলে নবানী।

ভালো লাগলো দিব্যেন্দুর নবানীর কথার ঐ সুরটা। ও হেসে বললে, সত্যি শুনতে পাইনি, একটু অন্যমনস্ক ছিলাম বোধহয়। কি বলোতো, মনটা কিছুতেই সুস্থির করতে পাচ্ছি না।

নবানী এবার গম্ভীর হয়ে গেল, বললে, পারবেও না কোনদিন তুমি তোমার মনকে স্থির করতে ?

হঠাৎ চোট খাওয়ায় চমকালো দিব্যেন্দু। তারপর থমথমে হয়ে বসে রইলো। কিছু বললে না।

—স্থির হবার মত বলিষ্ঠতা তোমার নেই। তুমি ঘটনা দেখে দিশেহারা হয়ে পড়, দুর্বল বলেই তুমি জ্বলতে থাকো, ছোট বেলা থেকে দেখছিতো তোমাকে—এক নিঃশ্বাসে বলে গেল নবানী। কেমন যেন রোক চেপে গেছে ওর দিব্যেন্দুকে আঘাত দেবার।

দিব্যেন্দু স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো নবানীর দিকে চেয়ে—এই ধারণা নবানীর তার সম্বন্ধে ! নিজেও যে ধারণা করতে পারে না—তবে কি নবানী তাকে ঘৃণা করে ! দুর্ব্বল মনে করে উপেক্ষা করে ? কিন্তু তার প্রকাশতো—চাপা আছে, তারই একটু প্রকাশ পেলো। প্রতিবাদ করবে সে ? না না সে দুর্বল নয়। জগতের সব কিছু তাকে উপেক্ষা করলেও দাঁড়িয়ে থাকবে—কিন্তু, দুর্বল ভাবলো শেষ পর্য্যন্ত নবানী তাকে—হঠাৎ মনটা ব্যাথার ভারে নুয়ে পড়লো দিব্যেন্দুর। মাথা নীচু করে বসে থাকলো, কিছু বললে না সে।

কথাগুলো বলে নবানীর মনটা খারাপ হয়ে যায়, কি দরকার ছিলো বলার ? জানাতো, সইতে পারবে না, আঘাত দিয়ে ওকে কষ্ট দেওয়া খালি—নিজেরই কেমন যেন কষ্ট হতে লাগলো—কেন বললে সে, আক্ষেপ করতে থাকে নবানীর মন।

—কিছু মনে করার জন্যে বলিনি কথাগুলো, মন খারাপ করার মত কি বলেছি আমি—ভিজিয়ে দিতে চায় নবানী আগের কথার আগুনকে। ভাল লাগছে না, এই অস্বাভাবিক ভাবটা।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ম্লান হেসে দিব্যেন্দু বললে, মনে করার কি আছে, তোমার চোখে আমি যা তা জানায় আমারই তো লাভ হলো, এতে মনে করার কি থাকতে পারে।

সহজ হলো না ও। শুধু ঐটুকুই দেখলে, আর কিছু কি ছিল না ঐ কথার ইঙ্গিতে—যাকগে, এতো জানা, সোজা সহজ করে ওতো নেবে না—নবানী মনকে প্রবোধ দেয়। তবু আবার খুঁত খুঁত করে উঠে মনটা নবানীর—না ভালো হলো না ওকে কস্ট দিয়ে।

—তুমি যা খুসি ভাবো না আমার সম্বন্ধে, কিন্তু তোমাকে ছন্ন ছাড়া দেখে কষ্ট হয় তাই জন্যেতো বলি, শুধুমধ্ তোমাকে বলে নিজেকে জাহির করার প্রবৃত্তি আমার নেই।

—কিন্তু ভাব হচ্ছে কেন তোমার, সত্যিই হয়ত আর এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারবো না, আমাকে চিনেছো তাইতো বলেছো—ম্লান বিষণ্ন স্বরে বললে দিব্যেন্দু।

—তবু সহজ হতে পারলে না, ভাল—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে থাকলো নবানী। দিব্যেন্দুও নীরব। কথা বললে না কেউ আর। শুধু সন্ধ্যেবেলার দখিন বাতাসের

কাঁপন এসে এই স্তব্ধতায় যেন একটা সুরের মুর্চ্ছনা জাগায়।

চিত্রা লুচি বেলতে বেলতে মাসিমার এ কথা-ওকথার জবাব দিচ্ছিলো আর মাঝে মাঝে অশোকের সম্বন্ধে দুএকটা কথা জিজ্ঞেস করছিলো। মনটা ওর অশোককে দেখতে চাচ্ছে, কিন্তু কেমন যেন একটা সঙ্কোচ, লজ্জা আসছে, কিছুতেই উঠে যেতে পারছে না। বুকের ভেতরটা টিপটিপ করছে।

—এখানে এসেই খাটতে হলো না রে, বিজয়া দেবী লুচি ছাড়তে ছাড়তে বললেন কড়ার দিকে চেয়েই।

—খাটনি না আর কিছু, বেশ ভাললাগছেতো আমার—চিত্রা বললে চাকিতে বেলুনটা নাড়তে নাড়তে।

—তোদের এ পাঠ নেই, বামুনই করে সব, আমার কিন্তু ভাললাগে না বাপু ঐ বামুনকে দিয়ে রান্না করাতে, ওরা কি ছাই নিজের করে রাধতে পারে। ছেলেপিলের ঘরকন্নায় ও বাপু শত কষ্ট করে রান্না করতে সুখ, তুই কি বলিস্?

—হ্যাঁ সত্যিই তো, ব্যালা তো সব হলো মাসিমা, আর কি করবো—হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বললে চিত্রা।

—আর কিছু করতে হবে না তোকে, যা হাত ধুয়ে গল্প করগে যা। আগুন-তাতে আর নয়।

চিত্রা উঠে পড়ে হাত ধুয়ে একটু থমকে দাঁড়ালো দালানটায়। তারপর আস্তে আস্তে অশোকের ঘরের দিকে চললো। কাঁপছে কেন হাত পা—দূর ছাই, কি যে হলো—মনে মনে বলে ওঠে চিত্রা।

ঐ তো অশোকদার গলা নয়। কি সুন্দর গম্ভীর সুরেলা কণ্ঠস্বর, কি সুর করে পড়ছে অশোকদা—এগিয়ে গেল অশোকের ঘরের দরজার কাছে ও।

কিন্তু এ কি! ওই করে কি ভগবান পেতে হয়! শুধু একটা কম্বল, গা কুট কুট করে না! খাটটা খোলা রয়েছে এক পাশে, কেন খাটে শুলে কি দোষ হয়—দরজার পাশে চিত্রা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে ঘরের সব কিছু।—না, চেহারা তো খারাপ হয় নি, বরং আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। কি বড় বুকখানা—ওখানে যদি একটু জায়গা পেতো, ঐ লম্বা নিটোল হাত দিয়ে একটু আদর করে কাছে টেনে নিতো—কি আবার এলো মনে—নিজের কথা ভাবছে কেন সে! এই কি নিজের কথা ভাববার সময়? কোথায় ওকে কি করে একটু সেবা করবে, কিন্তু তারই বা উপায় কোথা। বাঃ! কি সুন্দর শুদ্ধ উচ্চারণ! আর গলাটার স্বর যেন ভক্তিতে গদগদ করছে। মনটা টেনে নিয়ে যায়। চিত্রার মন আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যায় ঐ ভক্তিরসে—

বরং বরেণ্যং বরদং বরদাণাঞ্চ কারণং।
কারণং সর্ব্বভূতানাং তেজোরূপং নমাম্যহম্।
মঙ্গলং মঙ্গলার্হঞ্চ মঙ্গলং মঙ্গলপ্রদং।
সর্বং মঙ্গলাধারং তেজোরূপং নমাম্যহম্—

স্তব শেষে কার উদ্দেশ্যে নয়ন মুদে প্রণাম করলো অশোক। তারপর বইটা মুড়ে পাশে রেখে দিলো। দেখলো চিত্রা। তার কেমন চোখ জুড়ে এলো। সেও কাকে যেন প্রণাম করতে চায়।

বেশ কয়েকটা মুহূর্ত্ত ওর এইভাবে কাটে। তারপর ধীরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো চিত্রা।

—কে, আরে চিত্রা তুমি, এস বস, দিবুর সঙ্গে এসেছো বুঝি, হাসলো স্বাগতের হাসি অশোক।

লজ্জা আর সঙ্কোচে কেমন আড়ষ্ট হয়ে বসলো চিত্রা। কত কথা বলবে সে, কিন্তু একি হলো তার। ও শুধু ম্লান হাসলো একটু।

—তারপর কেমন আছো, খবর সব ভাল ?

এবার ঘাড় নেড়ে মৃদু কণ্ঠে বললে, ভাল। তারপর চুপ করে থাকলো চিত্রা—কত দূরের মানুষ যেন অশোকদা! চিত্রা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেললো।

—মাসিমা, মেসোমশাই ভাল আছেন ?

—হ্যাঁ, কিন্তু তুমি এ কি করছো, এই কম্বলে শুতে পারে কেউ—এবার সব লজ্জা সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে চিত্রা। ভেতরটা কাঁদছে ওর হাহা করে।

অশোক হেসে ওর দিকে চেয়ে বললে, কেন পারবো না, বেশ তো থাকি, কষ্ট হয় না তো।

—না, বিছানায় শোবে বল, অশোকের একটা হাত চেপে ধরে চিত্রা। চোখে জল এসে গেছে ওর।

অশোক চমকে ওঠে—এ কি !

—এ সব কৃচ্ছ্রসাধন না করেও ভগবানকে ডাকা যায়, বল-না যায় কি না—ভিজে গলায় বললে আবার চিত্রা। অশোকের হাতটা তখনো ছাড়েনি ও।

অশোকের মন একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে। তবু সে সংযত হবার চেষ্টা করে বললো, দেখ সাধনার একটা সময়ের জন্যে এগুলোর প্রয়োজন আছে। আমি সেই সময়টা এখনও কাটিয়ে উঠিনি, এই বলে চিত্রার হাত থেকে আস্তে আস্তে হাতটা সরিয়ে নিলো।

চিত্রা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে অশোকের দিকে।

—এতে আমার যখন কষ্ট নেই, তখন তোমার মন খারাপ করা অন্যায় চিত্রা। ব্যক্তি যেখানে সুখ পায় তাকে সেটাই তো দেওয়া উচিত, তুমিই বল না, হেসে বললে এবার অশোক।

এ কি সুখ! ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে তার। ও ধরা গলায় বললে, বেশী কিছু বলবো না আর।

অশোক বুঝলো, অভিমান আর দুঃখের ভারে চিত্রা জর্জ্জরিত। কিন্তু উপায় কি। তার তো কিছু করার নেই! অশোক চোখ বোজে। মনকে ফিরিয়ে নিয়ে চলে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেলে চিত্রা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো, তারপর অশোকের কোলের কাছের পুরাণটা নিয়ে নাড়া চাড়া করতে লাগলো।

বাইরে আলো চলে যাচ্ছে। সন্ধ্যা আস্তে আস্তে অন্ধকার রাত্রিতে মিশে যাচ্ছে। অশোক উঠলো, ঘরের আলো জেলে মৃদু হেসে বললে, আমায় তো এবার যেতে হবে চিত্রা।

—বেশতো, এই বলে চিত্রাও উঠে দাঁড়ালো।

—এস আবার কেমন, এই বলে অশোক আনলা থেকে চাদরটা নিলো।

—একটু দাঁড়াবে, চিত্রা এগিয়ে গেলো অশোকের দিকে।

অশোক চিত্রার দিকে তাকালো। চিত্রা একবার অশোকের দিকে চেয়ে হাঁটু মুড়ে বসে প্রণাম করলো।

—এ-কি! থাক, থাক, চোখ বোজে অশোক।

—প্রণাম শেষে উঠে দাঁড়িয়ে চিত্রা বললে, কিছু মনে করোনি তো আমার ব্যবহারে?

—না, না, মনে করার মত কিছুতো করনি তুমি, আচ্ছা চলি এখন কেমন—অশোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। চিত্রা চেয়ে থাকলো শুধু স্তব্ধ হয়ে।

দিব্যেন্দু চিত্রা চলে গেলেও শিবেন্দু বসে থাকলো খাবার ঘরে কিছুক্ষণ। স্তব্ধতা বিরাজ করছে। ভাসা ভাসা সব ছবি মনে আসছে ওর। কত মুখ মানুষের। কত টাইপ। তাদের সঙ্গে ওর সম্বন্ধের সূত্র—কে কতটুকু দাগ কেটেছে মনে। কেন যেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে—জীবনের এটাই কি পরম সার্থকতা। বিভিন্ন মানুষের পরিচিতি পাওয়া, জীবন জানা। হয়ত এটাই পরম সার্থকতা জীবনের। ধরে রাখতে যেও না, কিছু নিয়ে এগিয়ে চলো। তাইতো ও ছেড়ে এসেছে অনেক কিছু, অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে। এড়িয়ে চলেনি। বিলিয়ে দেয়নি ও। মধুর সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখাই বড়। থাক না কাদা থাক না পাঁক। একাতো পরিষ্কার করতে পারবে না, তবে কেন সরে যাওয়া।

এবার উঠে দাঁড়ালো ভাবনার পালা শেষ করে। খগেন যেতে বলেছে কি জন্যে? পশু বৃত্তিকে খুঁচিয়ে আনন্দ পাওয়ার

জন্যে কি—মন্দ কি! সাময়িক আনন্দ। ঠোকাঠুকি। ইজমের শ্রাদ্ধ। ব্যক্তিত্বের লড়াই—সব কেমন তাল গোলে পাকিয়ে যাবে শেষকালে। তারপর আসবে শিকার। কি বা হবে কে জানে! কিন্তু টিউশানি সারতে হবে যে। না, তাড়াতাড়ি পড়িয়ে যেতে হবে ওখানে, ওদের দুর্ব্বলতাগুলো দেখার সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা ঠিক হবে না—শিবেন্দু বেরিয়ে এলো খাবার ঘর থেকে।

নীড় নির্জ্জন। গোধূলি লগ্নের মিঠে নিরবতা বাগানে। কাছে মানুষ নেই। শুধু ঝিরঝিরে শব্দ। আর সুমিষ্ট গন্ধ ছড়িয়ে বাতাস গাছের মিতালি।

একটা মোটর এলো নীড়ের গেট পার হয়ে। কুৎসিত শব্দে মিষ্টি আবেশ নষ্ট হলো। যন্ত্র আর মানুষের মিতালি যে; হবেই—শিবেন্দু আপন মনেই হাসলো যেন একটু। তারপর জানালা দিয়ে উঁকি দিলো—মা এলো, সঙ্গে এটি আবার কিনি, ও, সেই মোটা বেড়ালটা। জানালার কাছ থেকে ফিরে এসে জুতো পরে নিলো শিবেন্দু। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো।

—সুচি, বিচিত্রা, আরে এরা গেল কোথায়, ও ভোলা, ভোলা—বাসন্তী কয়েকটা জিনিষের প্যাকেট হাতে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ডাকতে থাকলেন।

—বিচিত্রা ফেরেনি বোধ হয়, সিগারেট হাতে শঙ্কর বললে।

—দেখ দিকি বাবা কাণ্ডখানা। মেয়েগুলো সবাই মিলে বেরিয়েছে বোধ হয়। আর চাকরটা যা হয়েছে, ডাকলে সাড়া পাওয়াই মুস্কিল, তা বাবা তুমি বসো না, দাঁড়িয়ে থাকলে কেন।

এই যে মূর্তিমান, কোথায় ছিলি এতক্ষণ। ডেকে ডেকে যে গলা চিরে গেল। নাও এগুলো আমার ঘরে রেখে এস—এই বলে বাসন্তী জিনিষগুলো এগিয়ে দিলেন ভোলার দিকে।

ভোলা জিনিষ গুলো নিয়ে বললে, ক'দিক যাবো দেখি বলুন, এ'দিকে ঠাকুর ডাকে, এটা দাও ওটা দাও, ওদিকে বাবুর ওখানে ঝাঁটা দিবো, না আপনার কাছে—মুখভঙ্গি করে চলে যাচ্ছিলো ভালো, বাসন্তী ওকে ডেকে বললেন, দিদিমনিরা কেউ বাড়ী নেই ?

—না, সবাই তো বেরিয়েছে। খালি মেজ দাদাবাবু আছে, বাসন্তীর দিকে চাইলো ভোলা।

—আচ্ছা যা তুই।

ভোলা চলে গেল। বাসন্তী শঙ্করের দিকে ফিরে বললেন, দেখলে তো কত জ্বালা আমার—এই বলে একটা বেতের আরাম কেদারায় বসলেন।

শঙ্কর বড় বড় দাঁত বের করে হেসে বললে, আমাদের মত বোরিং লাইফতো নয়, আর যাই হোক, আমার তো বেশ লাগে আপনাদের বাড়ীর সব কিছু

—এটা তোমার প্রশংসা শঙ্কর—হাসলেন একটু বাসন্তী। ঠিক এই সময় শিবেন্দু এলো যাবার পথে। মাকে বললে, বেরুচ্ছি, ফিরতে একটু রাত হবে বোধ হয়।

বাসন্তী বললেন, আচ্ছা, তবে চেষ্টা করো খাবার সময় ফিরতে।

শিবেন্দু একবার মার দিকে দেখলে, তারপর হেসে বললে, খুব চেষ্টা করবো।

শিবেন্দু চলে গেলে বাসন্তী শঙ্করের দিকে চেয়ে বললেন, মেজ ছেলে, ও তোমাদের তো আলাপ নেই না, আলাপ করিয়ে দেওয়া হলো না তো, আচ্ছা পরে হবে—হাসলেন একটু বাসন্তী।

—বেশতো, কিন্তু আমি উঠি এবার, কাল পাঁচটা নাগাৎ আসবো, বিচিত্রাকে থাকতে বলবেন—উঠে দাঁড়ালো শঙ্কর।

—আচ্ছা বলে দেবো ওকে থাকতে, কিন্তু এক্ষুণি উঠবে, কিছু খেয়ে যাওনা বাবা, সেই কখন বেরিয়েছো, মাঝে একটু চা আর কেক, শরীর খারাপ হবে যে বাবা—উদ্বেগ-রেখা ফুটে ওঠে বাসন্তীর মুখেচোখে।

—না না, ক্ষিদে থাকলে কি আপনাকে বোলতাম না, খাবোখন একদিন আপনার হাতের রান্না, আজ চলি—হাত তুলে একটা নমস্কার করলো শঙ্কর।

—এস বাবা। আমি বলে রাখবো বিচিত্রাকে, বাসন্তীও উঠে দাঁড়ালেন, শঙ্করের সঙ্গে সঙ্গে মোটরের কাছ পর্যন্ত এলেন। বাসন্তী খাতির করতে জানেন। ভদ্রতা-অভিজ্ঞা তিনি, উপযুক্ত মহাজনের পাওনা সুদ একটু বেশী দিতে কার্পণ্য করেন না।

শঙ্কর চলে গেলে তিনি ওপরে উঠে এলেন। কাজ তাঁর অনেক বাকি এখনও। স্নান করতে হবে, প্রসাধনও আছে। রান্নার ফরমাস। তারপর মিঃ সোম আসবে, তবে একটু বিশ্রাম। তবু খুসী বাসন্তী। আজ একটা পয়সা খরচ হয়নি তাঁর—সব আজ শঙ্করই কিনেছে। কত বললুম, এটার দাম নাও শঙ্কর—না না থাক, আমি দেওয়া যা আর আপনি দেওয়াও তাই—না, ভালো ছেলেটা—হাসলেন একটু বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে

বাসন্তী—কিন্তু নীচু ঘর, একপুরুষে বড়লোক। তা হোক, দিনকতক যাক, বিয়ের একটা কথা পাড়লেই হবে। বিচিত্রার মনের গতিকটা কি, জেনে নিতে হবে। শেষকালে সব ভালগোল না পাকিয়ে যায়। কিন্তু মানাবে না যে মোটেই! শুধু পয়সা! ওটাই আসল—বাসন্তী কাপড় ছেড়ে তোয়ালেটা হাতে নিয়ে স্নানের ঘরে এগুলেন ভাবনাকে সঙ্গে নিয়েই।

—সত্যিই ভাই বিজয়, টাকাটাই আসল আজকের দিনে। যা করতে যাও না টাকা চাই, ভাল মন্দ যা চাও আগে চাই টাকা, সুতরাং টাকা রোজগার কর, ও সব তোমার আদর্শ পরে করো হে—সিগারেটে টান দিলো খগেন রায়।

আড্ডা বসেছে সবে ওদের চিৎপুরের একটা অখ্যাত চায়ের দোকানের পেছুনের ঘরে। খগেন রায়কে নিয়ে চারজন ওরা।

—ওটা ঠিক কি? বিজয় কিন্তু হয়ে বললো। বিজয় সাহিত্যিক। চেহারা বেঁটে, ফর্সা, রোগা। আর্থিক অভাব প্রচুর। কিন্তু সাহিত্যিক আদর্শের জন্যে আরো কষ্ট করতে রাজী সে, তাই প্রতিবাদ করে।

—হাঁহে ঠিকই, এই দেখ না ডালমিয়া কি না করছেন বাস্তু-হারাদের জন্যে, ছ' লাখ টাকা দিলো। মধ্যবিত্ত বেকারদের জন্যে আজ প্রাইম—মিনিষ্টার নেহেরুর সঙ্গে ঝগড়া করতেও পেছপা হয় না। কিসের জোরে, টাকারই তো! তা নৈলে বুকের পাটা হয়। বল না হে—আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলো শেষে একটু খগেন রায়।

বিজয় এবার চুপ করে থাকলো, যুক্তি পাচ্ছে না লড়বার ও।

—ঠিকই বলেছো তুমি, পৃথিবীতে সুন্দর কিছু ভোগ করতেও তো ঐ টাকা—নিখিলেশ বলে উঠলো তার পাইপটা দাঁতে চেপেই। রোগা লম্বা মাজা কালো রংয়ের চেহারা নিখিলেশের। মুখ চোখে লালিত্য নেই।

—তাইতো বলি টাকা হলেই সব আসবে দেশে।

—ভুল কথা, ভুল ধারণা তোমার—শিবেন্দু পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো।

—আরে কবি যে! খবর কি? উল্লসিত হয়ে উঠলো খগেন রায়।

একটা চেয়ারে বসে শিবেন্দু হেসে বললে, খবর তো অনেক, কাগজ দেখ নি, তা বাজার দরের মধ্যে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখলে অমনি হয়, কি বল বিজয়?

বিজয় ঘাড় নাড়লো। যা হোক তাহলে ঠোকাঠুকির মধ্যে তাকে আর যেতে হবে না। ও বললে তুমি বলো না শিবু, টাকাতেই কি সব হবে?

—কি করে হবে, দেখতে পাওয়া ঘটনার মধ্যে থেকে, আমেরিকার মত টাকার দেশে যে সময়ে দারিদ্র্যের জন্যে লেখিকা এ্যাগনিস স্মেডলি মারা যায় আবার সেই দেশ ইউরোপে লাখ লাখ ডলার সাহায্য করছে, বুঝতে পারো না কেন টাকা হলো Power কেনার মাধ্যম আজকের দিনে। খগেনটাও ঐ দলে ভিড়ে গেছে হে! তা খবর কি সব—শিবেন্দু চোখ বুলিয়ে নিলো সবার দিকে।

খগেন রায় একটু দমে গেছে যেন। তবু হাসবার চেষ্টা করে বললে, তোর উচিত ছিল রাজনীতি করা, কিন্তু কি করে কবি হলি তুই ভেবে পাইনে, কথায় রসের নামগন্ধ নেই। কবি হলো ঐ দেখ আমাদের শ্রীনিবাস, কেমন ভাবুক, ভাবছে খালি, আলুথালু গদগদ চেহারা।

শিবেন্দু হাসলো একটু। তারপর শ্রীনিবাসের দিকে চেয়ে বললে, দেখ খগেন কবিতাকে আমি মেয়েদের মত দেখি। সেই জন্যে মিশে যাইনি। কারণ শ্রীনিবাসের মত স্ত্রৈণ হয়ে জীবনের আর দিকগুলো অন্ধকার করতে রাজি নই।

—কথায় পারা যাবে না বাপু তোর সঙ্গে, কিন্তু বয়টা গেল কোথায়। কাট্‌লেট ভাজছে নাকি, ভাজছেই, ওরে ও গোপলা খগেন ডাক দিলো।

—যাই বাবু হয়ে গেছে।

শিবেন্দু হঠাৎ খগেনের দিকে কাঁধ ঘেঁসিয়ে বললে, আজ এতো টাকার গরম কেন হে, বলি নতুন শিকার নাকি, না পেমেণ্ট পেয়েছো মোটা রকমের।

—দুটো, মানে সোনায় সোহাগা, মোটা টাকাতো পেয়েছি তা ছাড়া বানোয়ারী কিছুক্ষণ আগে একটা টাটকা খবর দিলে, ভালই, গদগদ স্বরে বলে উঠলো খগেন রায়।

—রিয়েলি্য ইউ আর এ লাকি, মানি এ্যাণ্ড ম্যাটরিমানি—হাউ বিউটিফুল ইট্ ইজ! দিনান্তে 'ম'-কার প্রধান দিয়ে চিত্তশুদ্ধি, হাউ নাইস—হো হো করে উচ্চহাসি হেসে উঠলো শিবেন্দু

ঠিক এই সময় গোপলা কাটলেট নিয়ে এলো। গোলগাল বেঁটে ছেলেমানুষ। হাসিখুসি মুখখানা। এখানকার বাবুদের মনের মত। খগেনের দিকে চেয়ে বললে, আর তিনটে এখুনি নিয়ে আসছি, কিন্তু কি দোব; বাবু জিজ্ঞেস করলে, জিন না হুইস্কি।

—হুইস্কি নিয়ে আয় ব্যাটা—নিখিলেশ হঠাৎ উল্লসিত হয়ে বলে উঠলো।

কবি শ্রীনিবাস এবার একটু নড়ে চড়ে বসলো। লালা দিয়ে মুখটা ভিজিয়ে নিলো। তারপর শিবেন্দুর দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে হঠাৎ বললে, T. S. Eliotকে আপনার কি রকম লাগে শিবুবাবু? আমার তো খুব ভাল লাগে, ওঁর Burnt Norton, সময়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে, কি সুন্দর বলুন তো! সেই,—

> Time present and time past
> Are both perhaps present in time future,
> And time future contained in time past.
> If all time is eternally present
> All time is unredeemable.

শিবেন্দু চেয়ে দেখছিলো শ্রীনিবাসকে। জাহির করতে যেন সব সময় প্রস্তুত এরা! না, খালি কতকগুলো কথা মুখস্ত করার মত বলে যায়। প্রাণ নেই। অথচ প্রতিষ্ঠা এদের সমাজে বড় কিছু বলে! সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। হ্যাঁ, সবাই এরা ভেতরে এক বাইরে এক। তাও বিভিন্ন রূপে।

শিবেন্দু আবার শ্রীনিবাসের দিকে চাইলো। তারপর আলতো করে হেসে বললে, সত্যি বলতে কি এলিয়টের কবিতা ঠিক নিতে পারি না—আঙ্গিকের নতুনত্বে এলিয়ট অদ্ভুত। কিন্তু ভাবে প্রাণ পাই না, যা রবীন্দ্রনাথে পাই। তবে, আঙ্গিকের রূপান্তর ঘটানোই যদি হয় কবিতার চরম উৎকর্ষ, সে দিক থেকে তিনি সম্পূর্ণ বইকি।

শ্রীনিবাস চুপ করে গেল। কারণ মূলে তারও গলদ আছে। পাতা উলটানো থাকে কিন্তু প্রাণ থাকে না।

—এই যে নিন্ হুইস্কি, হোটেলের মালিক এলো একটা বোতল হাতে নিয়ে পেছনে গোপাল, হাতে কাট্‌লেটের প্লেট।

নিখিলেশ উল্লসিত হয়ে বলে উঠলো, শুকনো কথার কাব্যকে পেছনে ফেলে নেমে এস বন্ধুগণ এই জীবন্ত রসকাব্যে—এই বলে নিখিলেশ কাঁটা চামচ হাতে নিলো।

গোপাল হুইস্কি গেলাসে ঢেলে দিতে থাকলো ইতিমধ্যে।

শিবেন্দু এক টুকরো কাট্‌লেট্ মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে বললে, সপারিষদ খগেন দীর্ঘজীবি হোক্।

—সমর্থন করছি, এ আনন্দ ফেলে কোন্ চুলোয় যাবো আর—বললে নিখিলেশ।

—জায়গা আছে বইকি এখনও! গঙ্গার জলে, কিংবা লেকের জলে, জল, নারী-মাংস আর রসের লোভ ছেড়ে ভাসতে পারো বন্ধু—বিজয় বললে।

—তোমার কি এমনি অবস্থা নাকি হে? খগেন রায় বললো।

– সোডা ঢাল ছোকরা। খগেনের কথার উত্তর না দিয়ে বিজয় গোপালকে বললে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে। আগের সব কিছু মদের স্পিরিটে উবে গেছে। ধীরে ধীরে নেশাটা জমে উঠছে— শিবেন্দু দেখলো তার পিঙ্গল অর্ধনিমিলিত চোখ দুটো দিয়ে।

– –প্রেম আছে নাকি বলতে পারো কবি, তোমার কবিতার প্রেম– –শিবেন্দুর দিকে চেয়ে গেলাসটা হাতে নিয়ে বললে নিখিলেশ।

–প্রেম! চোখটা একটু বড় করার চেষ্টা করে হাসলো শিবেন্দু। তারপর বললে, আছে বইকি, প্রেম না থাকলে মানুষ বাঁচবে কি করে!

–বিশ্বাস করি না, প্রেম নেই, বুঝলে কবি প্রেম তোমার কল্পনায়, তোমার কাব্যে। কিন্তু নারীর মধ্যে —ছোঃ। এই আমি নিখিলেশ সেন, নিত্য নতুন নারীকে ঘাটি, নানা ধরণে নানা ধরণের, কিন্তু প্রেম, ছোঃ। স্রেফ দেহ নিয়ে কারবার। এই তো ভালো, কেমন নিত্য নতুন দেহ।

শিবেন্দু নিখিলেশের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে। তারপর বললে, এক ধরণের পারভার্স জীবনই এমনি। নারীকে দেহসর্বস্ব করে দেখে তারা, তুমিও তাই।

—গাল দিলে, তা দাও, কিন্তু বেশ লাগে নরম নরম মেয়েদের ঠোঁট, গাল, বুক; ঠিক যেন 'মোদক'। কবি প্রেম করেছো তা হলে, কিন্তু এই শর্মা, এই বলে নিজের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে নিখিলেশ বললে; ভানে প্রেম কোরো না কবি, প্রেম করিলে খোয়াবে সবি—হো হো করে হেসে উঠলো নিখিলেশ।

খগেন বললে, প্রেমে পড়েছে কে, তুই নাকি শিবু, বাহবা বাহবা।

শিবেন্দু বললে, পড়িনি কিন্তু পড়লে মন্দ কি, তবু তো একটি নারীকে মনে-প্রাণে পাবো। তোদের মত নারী শুধু দেহটা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে রাজি নই।

—বেশ বলেছিস্ শিবু, আমি প্রেমকে স্বাগত জানাচ্ছি আর জানাতেও থাকবো সাহিত্যিক হিসাবে, মানুষ হিসাবে। I like you very much.—শিবেন্দুর পিঠ চাপড়ে দিলো বিজয়।

শিবেন্দুর ভাল লাগে কেমন যেন বিজয়কে—ভেতরের ভালো মানুষটা যেন এর। অথচ দৈন্যের দায়ে কোথায় নেমে এসেছে। আর ঐ খগেন, কি বাভৎস দেখাচ্ছে ওকে। একটুকু মিষ্টতা নেই, হিংস্র লালসার মূর্ত প্রতীক।

ঠিক এই সময় রোগা কালো পায়জামা পরা সার্ট গায়ে একটা লোক খগেনের কাছে এসে বললে, সব রেডি বাবু, একদম ছিমছাম, ফিটফাট তাজা, গানাভি গাতি, রূপেয়া বেশী হাকছে লেকিন চলুন বাবু, সব ঠিক হোয়ে যাবে, কি বলেন,—উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলো লোকটা।

—ঠিক হ্যায়, নেই মংতা, চলো। রূপিয়া কেয়া হ্যায়, চলো। মনে ধরলে সব ঠিক কোরে দোব, এই, এই—আমি, হাত নেড়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো খগেন। নেশা ধরেছে ওর। কথা জড়াচ্ছে।

—চল বাবা, নিখিলেশও উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে আর সকলে।

—কি কবি নীরব কেন, কিছু বল. চল আজি অভিসারে—খগেন শিবেন্দুর কাঁধে একটা চাপ দিলো।

—অভিসারে! ঐ আবর্জ্জনায় অভিসারের স্বপ্ন তুমি দেখগে, শিবেন্দু বললে।

—স্বপ্ন বাসর থেকে নেমে এস কবি, দেখবে All women are in same mood—যাবে না নাকি তুমি তাহলে, চরিত্র নষ্ট হবার জন্যে, আমাদের কিন্তু চরিত্র হাতের মুঠোর মধ্যে, more or less flexible।

—যাবো না তো বলিনি, যাবো বইকি। শুধু দেখবো তোমাদের ঐ স্থূল রসের হাট কে।

—তাই চল বন্ধু দেখবেই চলো। পরদা সরিয়ে আগে বেরুলেন অভিসার-নেতা খগেন রায়, পেছনে আর সবাই।

অন্ধকার গলি। মাছের খোসা আর জঞ্জাল পচার গন্ধ এখানকার বাতাসে। শিবেন্দু নাকে চাপা দেয় চলতে চলতে। সবার পিছনে ও। পাশে শুধু সাহিত্যিক বিজয়।

দালালটা একটা বাড়ীর সামনে এসে বললে, এইদিকে চলিয়ে আসুন। অন্ধকারের মতই বাড়ীটা। দরজায়, রোয়াকে কেউ নেই দেহের বেসাতি সাজিয়ে—পুলিশ আছে যে! বাঁশগাড়ীতে তুললেই নিদেন দশটাকা খয়রাৎ, কি আরো বেশী—এদের পেছুতে লাগে কেন বলোতো সাহিত্যিক। কত উপকার করছে তোমাদের, প্রতিবাদ করো না কেন তোমরা? শিবেন্দু বললে বিজয়কে।

—এই রূপজীবিদের হয়ে প্রতিবাদ করা উচিত কিন্তু বোঝো তো সব, আমার মত লোকদের তাহলে আর বাঁচা

মুস্কিল। সম্মান, প্রতিপত্তি সব চলে যাবে যে। যারা এখানে স্ফূর্তি করে তারাও থুতু দেবে।

—থুতু দেবে, হ্যাঁ তা দেবে বই কি! আলো আর অন্ধকার তো এক নয়, এই বলে শিবেন্দু দরজাটায় একটু দাঁড়ালো।

—কই হে কবি চল ওপরে, খগেন সিঁড়ির কাছে এসে বলে উঠলো।

—এই যে যাই হে, শিবেন্দু সিঁড়ির কাছে এগিয়ে এলো বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে।

—আসুন, একটি মেয়ে দালালটার সঙ্গে দোতলার বারান্দায় ওদের অভ্যর্থনা করলো। আরো গুটি কয়েক মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো বারান্দায়। তারা চেয়ে থাকলো ঐ পাঁচটি নতুন লোকের দিকে।

—ঘরে চলুন, সকলেই তো—হাসলো মেয়েটি ঝরঝরে হাসি।

—কেন আপত্তি আছে নাকি? পিটপিট করে চাইলো খগেন। বেশ নেশাটা ধরে গেছে।

—আপত্তি! মোটেই নয়, মেয়েটি তার শাড়ীর আঁচলটা দোলাতে দোলাতে বললে।

শিবেন্দু পেছন থেকে মেয়েটিকে দেখছিলো—বা বেশ সুন্দর তো মেয়েটি! দীর্ঘাঙ্গী, সবল সুন্দর স্বাস্থ্য, ফরসা না হলেও রং মন্দ নয়। কথা বলার ধরণটিও ভাল লাগলো শিবেন্দুর।

—তবে তো ঘরে গিয়েই কথাটথা, তা চলো সখী।

—চলুন। মেয়েটি পিছন ফিরে সামনে এগিয়ে গেল একটা ঘরের দিকে।

বাঃ পিছনটিও চমৎকার, মনে মনে বললে শিবেন্দু। তারপর বিজয়কে হেসে বললে, তোমার নতুন কোন গল্পের নায়িকা করার মত চেহারা, কি বল সাহিত্যিক, প্লট ভাঁজা যেতে পারে।

বিজয় ঘাড় নেড়ে বললে, তা যেতে পারে।

ঘরের দরজার কাছে এসে শিবেন্দু বললে, যাও সাহিত্যিক, চেষ্টা করোগে নতুন কিছু খোরাক পাও কি না। আমি এবার চলি, ঐ কুৎসিত হল্লা আমার ঠিক সহ্য হবে না।

—একটুখানি থাকো না।

—কি হে কবি, বলি বাইরে কেন, ভেতরে এসো—ঘরের ভেতর থেকে নিখিলেশ বলে ওঠে।

এস, সকলকে বলে যাও তো, এই বলে বিজয় শিবেন্দুকে ঘরে টেনে আনে।

—কবি চলে যেতে চাচ্ছে যে—বিজয় বললে খগেনের দিকে চেয়ে।

মেয়েটি এবার শিবেন্দুকে লক্ষ্য করে।

—সে কি হে, এমন একটি ফুলের গন্ধ থেকে বঞ্চিত করবে, নিখিলেশ বলে উঠলো।

—ফুলেরও প্রকার ভেদ আছে নিখিলেশ, আর সেই ভেদের সঙ্গে রুচির সামঞ্জস্য আছে, সুতরাং চলি। তোমরা গন্ধে মাতোয়ারা হও, রসে ডুবে রসকেলী করো—এই বলে শিবেন্দু মেয়েটিকে একবার লক্ষ্য করলো, তাইতো মেয়েটি যে লাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু রাগে না অপমানে, কে জানে।

—তা হলে সত্যিই চললি তুই—খগেন তাকিয়া ঠেস দিয়ে ঢুলুঢুলু চোখে চাইলো শিবেন্দুর দিকে।

—হ্যাঁ, আচ্ছা নমস্কার, কিছু মনে করবেন না—মেয়েটির দিকে চেয়ে হাত তুলে নমস্কার জানালো শিবেন্দু।

মেয়েটি কিছু বললো না, শুধু হাত তুলে প্রতি নমস্কার করলো তার রক্তিম স্তব্ধতা নিয়ে।

শিবেন্দু আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

শিবেন্দু ভ্যাপসা গলিটা ছেড়ে হাঁপ ছাড়লো। কি কুৎসিত পরিবেশ, তবু বাঁচার কি আগ্রহ মেয়েগুলির—এটাই ভালো। ট্র্যামের জন্যে চিৎপুরের মোড়ে দাঁড়ালো শিবেন্দু—ঐ ঘরের ছবিটা ভাসছে তখনও তার মনে।—খগেন, শ্রীনিবাস, বিজয়, নিখিলেশের ছবি আর ঐ মেয়েটি—মদমত্ত খগেন হয়ত ছিঁড়বে মেয়েটাকে সারারাত ধরে, তারপর সকালে সে অন্য মানুষ—দেশের প্রতিষ্ঠাবান নেতা, সমাজসেবী, ব্যবসায়ী খগেন রায়। আর কবি শ্রীনিবাস হয়ত একটু বাদেই বাড়ী ফিরবে। তারপর স্ত্রীর গঞ্জনা, ছোট ছেলের চিৎকার শুনেও চুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়বে। বিজয়কেও শুনতে হবে অনেক কিছু, মা, ছোট বোন তারপর পঙ্গু বাবা।—অভিযোগ! কিন্তু শুনবে কি ও। হয়ত সকলকেএড়িয়ে কালিপড়া হেরিকেন জ্বালিয়ে কাগজ কলমে মেতে যাবে। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি, সাহিত্যিক, কবি—কেমন যেন বেদনা অনুভব করে শিবেন্দু-শ্রীনিবাস-বিজয়ের জন্যে—কে জানে কতদিন টিকে থাকবে। দারিদ্র্য আর লোভের সঙ্গে যুঝছে ওরা। কিন্তু নিখিলেশ কি ঐ বিকৃতি নিয়েও শান্তিতে আছে? অর্থের

অভাব নেই ওর। দিনের পর দিন এক একটি নারীর দেহলাভ করেই কি ও সন্তুষ্ট! না, হয়ত মনের জ্বালা ওর অনেক। আর ঐ মেয়েটি!—বহু পুরুষের মন মত হতেও কি ক্লান্তি আসে না—হয়ত আসে। ভোরের আলোতে যখন সব মানুষ জাগে নতুন করে, ও তখন রাতের অন্ধকারেই পড়ে থাকে। কে জানে! বিচিত্র মানুষ, তার মন আর প্রকৃতি। ভারী অদ্ভুত সব। দেখতে আর জানতে কত ভালো লাগে যেন—শিবেন্দু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চাইলো ট্রামের উদ্দেশ্যে।

ট্রাম এলো। শেষ ট্রাম। বেশী রাত হয়নি। সবে পৌনে এগারোটা। বাড়ী ফিরতে বড় জোর বারোটা—শিবেন্দু উঠে বসলো সামনের একটা সীটে। বেশ খালি ট্রাম। ভালো লাগলো তার এই খালি ট্রামটা। যা ভিড় কলকাতায়, খালি কিছু পাওয়াই মুস্কিল। মাথাটা বেশ হাল্কা লাগছে বাতাসে—একটু যেন ধরেছিলো। মাথাটা আর একটু কাত করে দিলে জানলার ধারে ও। ঝির ঝিরে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে গায়ে মুখে আর মাথার চুলে। ভাল লাগে শিবেন্দুর। হঠাৎ ছোটবেলায় মার কোলে শুয়ে থাকার কথা মনে পড়ে গেল—ঠিক এমনি হাওয়া, সন্ধ্যেবেলায় বাগানের কোলে বারন্দায়। সে মা আজতো আর নেই। আর তেমনি ছোটবেলায় সে আর তার মন—কত আজব কল্পনা আসতো ঐ আকাশের অন্ধকার থেকে—চলে গেছে ঠিক এই বাতাসগুলোর মত। আজ গুমোট সব খানে। বাড়ীতে, বন্ধু বান্ধব মহলে, সমাজে, দেশে। খালি নেই নেই শব্দ। হতাশার ফিসফিসানি—কিছু পেলাম নাতো! আশাভঙ্গ আর অশান্তি। তবু মানুষ বাঁচার চেষ্টা করবে আর সেই চেষ্টা

থেকে সে শান্তির সন্ধান পাবে—শিবেন্দুর মনটা কেমন যেন একটু তৃপ্তি অনুভব করে। চোখ বুজে মনের আমেজটা উপভোগ করতে থাকে। শেষ ট্রামের গতি-বৃদ্ধির সঙ্গে বাতাসের ঢেউ ওকে আঘাত করে যায় ঘন ঘন।

রাত অনেক। সাড়ে বারোটার কাছাকাছি। বেশ শীত শীত করছে। শিশির ভেজা ঘাসে জুতো ভিজে ওঠে। শব্দ হয় না। নীড় ঘুমুচ্ছে! শিবেন্দু এলো। নীড়ের শেষ মানুষ যেন ও। সেও সবার মত গভীর নিদ্রার অন্ধকারে মিশে যাবে। সারা দিন যা কিছু ঘটলো তার হিসাব কষা শেষ হলো। মানুষের নানা ভাষার মুখ বিদিশায় বিলীন হয়ে যাবে—শিবেন্দু সারা বাড়ীর দিকে চোখ বুলিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। তারপর আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো বারান্দাটায়। ভোলা শুয়ে আছে—গা ঠেলে ডাক দিলো শিবেন্দু মৃদু স্বরে।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। নীড়ের মানুষদের জীবনে দ্রুত পরিবর্তন আসছে, শিবেন্দু লক্ষ্য করে। কেমন যেন আরো ছাড়া-ছাড়া ভাব। বিচিত্রা, চিত্রা, দিব্যেন্দু, মা এমন কি শুচিটাও কত তাড়াতাড়ি পাল্টাচ্ছে। সময় আর ঘটনা—এ দুটো দিয়েই কি মানুষের রূপ নির্ণয় হবে! আর কি কিছু নেই? হয়ত নেই। ভাঙন সুরু হয়েছে বেশ বুঝতে পারে। সময় এনেছে এখানে আর্থিক সঙ্কট। ঘটনা লোভকে খুঁচিয়েছে। আর তা চরিতার্থের সুযোগ ও পেয়েছে। দুর্ব্বল এরা, হারাচ্ছে যেন তাই—এটা স্বাভাবিক, বোদলে যাবেই—সহজ মনেই স্বীকার

করে নিলো শিবেন্দু। মনে ওর জ্বালা নেই। তবু একটু খুঁতখুঁত করতে থাকে মনটা—অনুভূতির সূক্ষ্মতন্ত্রীতে কাঁপনও থাকে যেন—খাবার ঘরে বসে বসে ভাবছিলো শিবেন্দু একা একা।

সবাই ব্যস্ত। এক সঙ্গে বসার সময় নেই আর। সকালের চায়ের মজলিসটা ভেঙে গেছে বললেই হয়। সবাই এক সঙ্গে হতে পারে না আগের দিনের মত। ভোলা আর ঠাকুর যেন আপন সবার। আত্মীয়তার মধুর যা কিছু সম্পর্ক; সব চলে যাচ্ছে আপন জনের মন থেকে। এ যেন ভাঙা হাট—তবু সে মিলতে চাইবে। যে ভাবেই হোক না কেন—সিগারেট ধরালো শিবেন্দু একটা।

ঠিক এই সময় বিচিত্রা ঘরে ঢুকলো। আরো কুৎসিত আর অশ্লীল যেন। বিরক্তি আর ক্লান্তিতে ভরা বেপরোয়া লজ্জাশূণ্য মুখখানা দেখে চমকে ওঠে শিবেন্দু।

—ভোলা ও ভোলা, চাকর নয় তো প্রিন্স, যত সব—

—ভোলা এলো, বললে, কি বলছেন ?

—বলছি তোমার মাথা আর মুণ্ডু, চাটা দিয়ে আসো নি কেন ?

—সময় হয়ে ওঠেনি, এনে দিচ্ছি। নিতান্ত নির্লিপ্ত স্বরে বলে বেরিয়ে গেল সে।

—সময় হয়ে ওঠেনি, ইডিয়ট। মাথাটা দুই কনুইএ ভর দিয়ে মুখ নীচু করে বলে উঠলো বিচিত্রা।

শিবেন্দু এতক্ষণ কিছু কথা বলেনি, ও শুধু দেখছিলো বিচিত্রাকে। এবার বললে, এখানে এসে খেলেই তো পারিস, আবার ঘরে কেন।

বিচিত্রা উত্তর দিলো না। বোধ হয় প্রয়োজন নেই বলে মনে করলো ও।

—তারপর বিচিত্রা কেমন আছিস আজকাল, দেখা সাক্ষাৎ পাওয়া ভার তোদের! তা কেমন পড়াশুনা করছিস্, চেহারা দেখে মনে তো হয় না পড়াশোনা করিস্, ভ্রূ কুঁচকিয়ে হেসে চাইলো শিবেন্দু।

বিচিত্রার মেজাজটা চড়ে ওঠে। কাল রাত থেকে তার মেজাজ ঠিক নেই। দূর পরিচিতার মত ও বললে, চলছে এক রকম।

—তা বেশ, এক রকম চলা ভালো, কিন্তু unbalanced হওয়া কি ভাল?

বিচিত্রা একটু চমকে চাইলো মেজদার দিকে—মেজদার চোখে সন্দেহের দৃষ্টি নাকি? সে কি ধরা পড়েছে? তার গোপন জীবন কি জেনে ফেলেছে মার মত মেজদাও নাকি—হঠাৎ জ্বলে ওঠে বিচিত্রা। ও বললে, নিজের ভাল-মন্দ বিচার করার মত বয়স আর বুদ্ধি আমার হয়েছে।

শিবেন্দু হাসলো একটু বিচিত্রার দিকে চেয়ে। তারপর বললে, আমি তো তোর বয়স আর বুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিনি, চটছিস কেন তুই। তোর ঐ কথা বলার ধরণটাই তো কেমন কেমন লাগে। এটাই তো চিত্তবৈকল্যের লক্ষণ।

—বেশ আমার চিত্তবৈকল্যই ঘটেছে, তাতে তোমার কি কোন ক্ষতি করেছে—হঠাৎ রেগে উঠে দাঁড়ালো বিচিত্রা।

—ক্ষতি হয় বইকি, সে থাক কিন্তু তুই যে সত্যিই খুব রেগে গেছিস, চা খেতেও ভুলে যাচ্ছিস। শিবেন্দু সহজ হাসি হাসলো একটু উচ্চ স্বরে।

বিচিত্রা কিন্তু আর দাঁড়ালো না মেজদার ঐ হাসির পর। এ হাসি সহ্য করার মত মন নেই ওর।

শিবেন্দু স্তব্ধ হয়ে গেল যেন একটু—এ কি হচ্ছে মেয়ে-গুলোর! একটুতেই চটে যায়। মন খুলতে পারে না। না আর দেখছি এখানে বাস করা চলবে না—শিবেন্দুও উঠে পড়ে। চা খাওয়া শেষ হয়েছে ওর অনেকক্ষণ।

বিচিত্রা অনেক এগিয়ে গেছে। ইদানীং বিচিত্রাকে শঙ্করের সঙ্গে দেখা যায় সন্ধ্যের দিকে। ময়দানে, লেকে, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে, যশোর রোডে গাড়ী ছোটে ওদের সন্ধ্যের আমেজী হাওয়ায়।

—বেশ থ্রিলিং নয় সন্ধ্যেবেলাটা বিচিত্রা—শঙ্কর বললে গাড়ী চালাতে চালাতে তার তীক্ষ্ণ সরু স্বরে।

বিচিত্রার কানে লাগে। কিন্তু ভাল লাগার মত করেই বলে, রিয়েলি নাইস! বিশেষ করে তোমার সঙ্গে—ঘেঁসে বসে বিচিত্রা শঙ্করের গায়ে গা লাগিয়ে।

—তোমাকে পাশে নিয়ে এতো ভালো লাগে গাড়ী চালাতে কি বলবো—এখানে একটু বসবে নাকি? বেশ ফাঁকা।

—বেশ তো, কিন্তু তুমি যে বলেছিলে আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরে কাভারে যাবে, তোমার সেই বন্ধুটি আসবে।

—হ্যাঁ যাবো তো, সময় আছে এখনও অনেক, চল একটু বসি। এই বলে শঙ্কর গাড়ীটাকে রাস্তা থেকে ঘাসের জমিতে নামিয়ে থামালো।

বিচিত্রা নামলো। শঙ্কর গাড়ী থেকে নেমে বড় বড় দাঁত বের করে হেসে বললে, এ দিকে এস, ওখানে গেলে তো তোমায় পাবো না। তারপর বিচিত্রার হাত ধরে বললে, চল ঐখানটায় বসি কেমন।

বিচিত্রা ঘাড় নাড়লো। গাটা ওর শিরশির করে একটু। উত্তেজনায় না ঘৃণায় ঠিক বুঝতে পারে না বিচিত্রা। অনেক দিন থেকেই ওর দেহটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করছে শঙ্কর। প্রথম প্রথম ঘৃণার জন্যে গাটা শিরশির করতো বিচিত্রার। এখন প্রথম দিনের মত নয় মনটা তার। আর খুব আড়ষ্টতা আসে না আগের মত।

—এস লক্ষ্মীটি, বসো না একটু, এই বলে শঙ্কর বিচিত্রাকে জোরে কাছে টেনে নিয়ে বসালো। তারপর ওকে জড়িয়ে ধরে শঙ্কর তার মোটা কুৎসিত ঠোঁটটা এগিয়ে নিয়ে যায়।

এটা অসহ্য। এ জিনিষটা এখনও সহ্য হচ্ছে না। এখানে সমরেশই ভাল—আড়ষ্ট হয়ে যায় বিচিত্রা।

—তুমি যে কি ভাল কি বলবো বিচিত্রা—পিষে ফেলতে চায় শঙ্কর।

—তুমি কি কম—আলতো হাসি হেসে এলিয়ে দিয়ে চোখ বোজে বিচিত্রা। আবেশে কি না কে জানে। শঙ্করের পাশব

মনের ঝাপটায় কাঁপছে বিচিত্রা। ঘৃণা আর আনন্দ মিশে গেছে উত্তেজনায়—সর্পিণীর মত পাক দিয়ে জড়ালো ও শঙ্করকে।

তারপর অন্ধকার ঘন হয়। নির্জন বনানী ঝিঁঝিঁতে থমথম করে। গম্ভীর সুর ওঠে। ওরা ভয় পায়। উঠে পড়ে ওরা ক্লান্তি নিয়ে মাটির শ্যামল আস্তরণ ছেড়ে। গাড়ী ঘোরে। তীব্র কর্কশ আলো ফেলে ছুটে চললো গাড়ীটা আবার নতুন করে উত্তেজনার প্রাসাদ গড়তে।

উৎসব মুখর কাভারে। রাস্তার নিওন আলো আর নানা ধরণের গাড়ীগুলো রাস্তার মানুষদের মনে কৌতুহল আর মোহ এনে দেয়। প্রলুব্ধ হয়। ছুটে আসে অনেকে ঐ নীলোজ্জ্বিত স্বপ্নের টানে।

শঙ্করের মোটর এসে দাঁড়ালো কাভারের সামনে। বিচিত্রার মন চন্‌মনিয়ে উঠলো। ভারী ভাল লাগে কাভারে তার। ঠিক তার মনের মত। ও শঙ্করের সঙ্গে রোজই আসে এখানে সন্ধ্যার পর। থাকেও অনেকক্ষণ। প্রায় দশটায় ফেরে। নতুন লাগে রোজই। শঙ্করের সঙ্গে কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেতরে এলো বিচিত্রা।

—চল ঐ দিকে, আমরা যেখানে বসি রোজ, শঙ্কর বললে।

বিচিত্রা কিছু বললো না। এগিয়ে গেল। ও দেখছিলো চারদিকের নানা রংয়ের পুরুষ আর মেয়েদের। আর একটু মিশ্রগন্ধ নিচ্ছিলো ও। বেশ লাগে এই গন্ধের মিশ্রণ—মদ, সিগার, সিগারেট, খাবার আর প্রসাধনের একসঙ্গে মেশা গন্ধ। আর কানে বাজে বিলিতী অরকেষ্ট্রা—ভারি মধুর।

—এই যে আসুন শঙ্কর বাবু, একটি সুন্দর লম্বা চেহারার ভাটিয়া-টুপী পরা লোক বললে একটি টেবিলের কাছে ওরা আসতেই।

—আরে আগরওয়ালা যে, এরই কথা তোমায় বলেছিলুম বিচিত্রা—শঙ্কর বিচিত্রার দিকে চাইলো।

আগরওয়ালা উঠে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বিচিত্রার দিকে চেয়ে বললে, বসুন।

Thanks—আলতো করে একটু হেসে বললো বিচিত্রা।

শঙ্কর বসে আগরওয়ালার দিকে চেয়ে হেসে বললে, পরিচয়টা করিয়ে দিই তোমাদের। ইনি মিস বোস, আমার বান্ধবী, আর এই আমার বন্ধু মিঃ আগরওয়ালা—এই বলে শঙ্কর বিচিত্রার দিকে চাইলো। তারপর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, তুমি কিন্তু খুব আনন্দ পাবে বিচিত্রা এর সঙ্গে আলাপ করলে, লোহার ব্যবসা করলে কি হবে খুব রসিক লোক, কি বল আগরওয়ালা ?

আগরওয়ালা হাসলো একটু। তারপর বিচিত্রার দিকে চেয়ে বললে, লোহার ব্যবসা করি বলেই কি একদম লোহা হয়ে যাবে নাকি, লোহা সে তো আপনার ঐ সব গানের সুর আসে না মিস্ বোস ?

বিচিত্রা চটুল হাসি হেসে ঘাড় নাড়লো। কিছু বললো না। ও শুধু আগরওয়ালাকে খুঁতিয়ে দেখছিলো। শঙ্করের মত লোহার ব্যবসা করে কিন্তু কত তফাৎ যেন—চেহারায়, পোষাকে, আর বোধ হয় টাকার দিক থেকেও অনেক উচ্চস্তরের শঙ্করের চেয়ে।

—কি জানেন মিস্ বোস, আমি ঠিক আমাদের দেশোয়ালীদের সঙ্গে মিশতে পারিনে, বাংলা মলুকে ছোট থেকে আছি। তাই বাঙ্গালীকেই বেশী পছন্দ করি—মুখে হাসি আর চোখে রেশ টেনে বললে আগরওয়ালা।

—সেতো দেখতেই পাচ্ছি, আপনার কথাবার্ত্তা অবিকল আমাদের মত। বেশ ভালই হলো আলাপ হয়ে, এখানে আসেন তো ?

বিনয়ের হাসি হেসে আগরওয়ালা বললে, না এসে উপায় কি বলুন। সারাদিন তো লেনা-দেনা করেই কাটে, তারপর একটু এখানে মনটাকে আরাম না দিলে চলে কি, আপনিই বলুন—চাইলো উৎসুক হয়ে আগরওয়ালা।

বয় এলো।

আগরওয়ালা শঙ্করের দিকে চেয়ে বললে, আজ আমিই, তা কি বলবো—চোখে যেন কিসের ইসারা থাকে।

শঙ্কর বললে, বল না, স্পেশাল মেনু যা আছে আর হুইস্কি, তা বিচিত্রা তুমি কোন ড্রিঙ্ক ?

—না, অরেঞ্জ স্কোয়াস।

—ঠিক হ্যায়, লে আও।

—জী সাহাব—বয়টা চলে গেল।

—তারপর মিস্ বোস, বলুন কেমন লাগে এ জায়গা।

—চমৎকার, সত্যি এতো সুন্দর লাগে এখানে আসতে একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে বিচিত্রা।

আগরওয়ালা লুব্ধ দৃষ্টিতে বিচিত্রাকে দেখছিলো। বাঙ্গালী মেয়েকে বেশ লাগে তার। বাঙ্গালী মেয়েই সুন্দর সবদিক

থেকেই। খুসী হলো আগরওয়ালা, অনেকদিন বাদে এমন সুন্দরী ঘরওয়ানীর সঙ্গে আলাপে। গদগদ হয়ে উঠে বললে, আমারো খুব ভাল লাগে, ভালোই হলো একসঙ্গে কাটবে রোজই—এই বলে ও শঙ্করের দিকে চাইলো।

শঙ্কর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চারিদিকটা দেখছিলো। এদের আলাপে আগ্রহ নেই যেন।

—আপনি রোজ আসেন বুঝি—বিচিত্রা জিজ্ঞেস করে।

—হ্যাঁ, তবে সময়ের কোন ঠিক নেই, আপনি কি—।

—আমি রোজ নয়, শঙ্কর যেদিন নিয়ে আসে, আসি—হাসলো বিচিত্রা একটু।

—আসুন না কেন রোজই, বেশ কাটবে সকলে মিলে। আগরওয়ালা আরো কিছু বলে যেন তার চোখের চাহনিতে।

বিচিত্রা বুঝলো। ভালোই লাগলো। কিন্তু ঢাকলো, শুধু আলতো করে বললে, বেশ তো।

আগরওয়ালা কিসের মৌতাতে যেন মশগুল হলো, একটু চোখ বুজলো যেন। তারপর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো; ইণ্ডিয়ায় বাংলাই আছে আগে, এ আমি মানছি মিস্ বোস। গিয়া হপ্তায় এম্পায়ারে কি রকম ড্যান্স হলো। দেখেছেন আপনি?

বিচিত্রা একটু নড়ে আঁচলটা ঘাড়ের কাছে সরিয়ে একটু হেসে বললে, হ্যাঁ দেখেছি বই কি, আমারই বোনই নাচলো সেদিন মেইন রোলে।

—কেয়া বাত! বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে চাইলো, তারপর একগাল হেসে বললে, আমি বহুত তারিফ করছি মিস্ বোস

আপনাকে, আমাদের দেশের ওল্ড কালচারকে ফিরিয়ে আনতে আপনারা বহুত মেহনত করছেন। আপনার বহিন ভারী ভাল ড্যান্স করেছেন ঐ দিন।

শঙ্কর এবার যোগ দিয়ে বললে, সত্যিই বিচিত্রা আমি ভাবতেই পারি নি সুচিত্রা এতো ভাল নাচতে পারে। চমৎকার মানিয়েছিলো ওকে ওদিন।

বয় এলো। খাবার দিয়ে গেল।

বিচিত্রা খুঁতিয়ে লক্ষ্য করছিল শঙ্করকে! সেদিনের শো'র পর থেকেই যেন শঙ্কর একটু বেশী বলছে সুচিত্রা সম্বন্ধে। এতোটা কি শুধু প্রশংসা না অন্য কিছু, আশ্চর্য্য কি—মনে মনে হাসে বিচিত্রা। কিছু বললেনা সে, কাঁটা চামচ তুলে খাবারে মনযোগ দিলো।

আগরওয়ালা খাবারে চোখ দেবার আগে নীচু চোখেই একবার বিচিত্রার বুকটা দেখলে তারপর কাঁটা দিয়ে এক টুকরো খাবার তুলে বিচিত্রার মুখের দিকে চেয়ে ঠোঁটে হাসির ঝিলিক দিয়ে বললে, আপনার রোশনাই কিন্তু আরো অনেক, আপনার ছোট বহিন ছোটই আছে, কি বলো শঙ্করবাবু?

শঙ্কর চাইলো আগরওয়ালার দিকে। অদ্ভুত দৃষ্টি বিনিময় শেষে হাসলো দুজনই, একটু কেমন ব্যবসায়ী হাসি। তারপর খাবারকে আকর্ষণ করলো ওরা মনোমত করে। কথা নেই। হলের নানা মানুষের গুঞ্জন, বিলেতী চটুল অর্কেষ্ট্রার সুর আর নানা গন্ধে মিশে গেল ওরা।

রাত তখন পৌনে এগারোটা। দিব্যেন্দু ফিরছিল বাড়ী দিনান্তে ক্লান্তিতে সারা হয়ে। রাস্তা নির্জন, মাঝে মাঝে দু'চারটে মোটর যাওয়ার আওয়াজ শোনে, ফিরেও তাকায় না স্বভাব কৌতূহলে। এ সময়টা বাইরের নতুন কিছুর অস্তিত্বের উপলব্ধি থাকে না মনে। পিছনে যা ছিল আর ছিল না তারই কান্না শুধু—এ কান্না শান্ত হবে গভীর রাতে, ঘুমের অচেতনে নতুন কিছু যখন বুনবে ওর মন।

পা ফির্ছে ঘরে, যন্ত্র চলার মত।

ঐ যে নীড়ের গেট! আবছা আলো-অন্ধকারে কালো গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, তারই পাশে দুটি ছায়ামূর্তি—দূর থেকে চোখে পড়লো দিব্যেন্দুর। হয়তো বিচিত্রা আর সেই লোকটা—প্রাত্যহিক আলাপনের শেষ ছেদটুকু টানছে—দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে অজান্তে একটা। হয়তো এ ভাবনার কোন দরকার নেই বলে। এগিয়ে চলে দিব্যেন্দু ধীর মন্থরে। দিব্যেন্দু গেটের সামনা সামনি আসতেই ছায়ামূর্তির আলাপ-নিভৃতি আচম্‌কা ভেঙে গেল।

মেয়েটি দ্রুত বাড়ীর ভেতরের দিকে চলে গেল। আর একজনা মোটরে উঠলো—বিচিত্রা আর সেই লোকটা বোধ হয়। কিন্তু বিচিত্রাতো আজকাল সন্ত্রস্ত হয় না, উপেক্ষাই করে তাকে—হঠাৎ মনটা পরিবেশের পিছুতে ছুটে চলে দিব্যেন্দুর।

মোটরটা ছেড়ে গেলে গেটের কাছে আসতেই দিবোন্দু আর একটা মোটরের হর্ণ শুনলো পিছনে। চমকে সরে এলো ও ফুটে। গাড়ীটার ড্রাইভার কি বললো ওকে উদ্দেশ করে, তারপর ব্রেক্ কষলো ঠিক নীড়ের গেটের সামনে, দেখলো দিব্যেন্দু।

এ কি! বিচিত্রা নয়? পা থেমে যায় হঠাৎ দিব্যেন্দুর। বিচিত্রাই তো—কি নির্লজ্জ অশ্লীল হাসি, সঙ্গে কে লোকটা? নতুন বন্ধু! এতো পুরুষ বন্ধু কেন ওর? এটা কি ভাল করছে। সমালোচনা সুরু করছে দিব্যেন্দুর মন দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

—কাল তা'হলে যাচ্ছেন তো—হেসে বললে লম্বা লোকটি।

—Sure, কিন্তু আজকের মত দেরী নয় কিন্তু।

—না, না সে হবে না, just at Seven আমি এসে যাবে।

—Thats it, then—হাই তোলে বিচিত্রা।

—নিদ্ আসছে? তবে তো আমি চলি, Good night—হাত বাড়ালো বিচিত্রার দিকে লোকটা। করমর্দনে কয়েকটি মুহূর্ত কাটলো। তারপর বিচিত্রা হেসে বললে, শুভরাত্রি।

—শুভরাত্রি! ভারী সুন্দর তো আপনার কথাটি, আমি শিখে নিলুম—একটু খুসীর হাসি হাসলো লোকটি। তারপর গাড়ীতে উঠে বসলো। গাড়ী স্টার্ট দিলে বিচিত্রা তার ব্যাগটা তুলে নাড়লো। তারপর চাইলো দিব্যেন্দু যে দিকে দাড়িয়ে ছিলো সেইদিকে। হঠাৎ মুখটা যেন কুঁচকে উঠলো ওর—গ্যাসের ম্লান আলোতে দেখতে পেলো দিব্যেন্দু। কয়েকটা মুহূর্ত শুধু, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সহজভাবেই গেট দিয়ে ভেতরে চলে গেল বিচিত্রা।

অপরিচিত রাস্তার লোক যেন—সত্যিই তো তাই। আজ তো আর কিছু নয় সে এদের কাছে। না না নীচ নোংরা ওরা, কোন পরিচয় নেই ওদের সঙ্গে,—রাগে অপমানে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত কেমন যেন একটা অস্বোয়াস্তিকর কাঁপন জাগে দিব্যেন্দুর।

সারা দিন বেশ থাকে দিব্যেন্দু নিকট-পরিচিত জনের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আজকাল। নবানীদের বাড়ী থেকে সেদিন ফেরার পর থেকেই ও আবার রাজনীতিতে ডুবে গেছে। গাধার মত খাটছে। ইলেকশ্যান ও করেছে। একটা রফার মধ্য দিয়ে নতুন-পুরোণো নেতৃত্বের বিরোধ মিটিয়েছে। . তারপর কাজ ঃ রিলিফ—হাজার হাজার বাস্তহারা,—চিঁড়েও জুটছে না—সরকারী সাহায্য নেই। পুনর্বসতি হচ্ছে না, যা হচ্ছে তা অস্বাস্থ্যকর—নীচ আর চারিত্রিক গাম্ভীর্য্য হারিয়ে ফেলছে। পুনর্বাসন ইজ্জত কেড়ে নিচ্ছে ওদের মেয়েগুলোর! দেহ পণ্য বেসাতির হাটে ভিড়িয়ে দিচ্ছে—টাকা—শুধু—নামি-অনামি নেতা, স্বেচ্ছা-সেবকেরাও দলে ভিড়েছে! ভেসে যাবে। উপায় নেই। হিমসিম খাচ্ছে দিব্যেন্দু। খুন চাপছে। জ্বালা ধরছে। কিন্তু তবু ভাল লাগে আজ ঐ রাজনীতির চাকায় চড়ে মানুষের হাটে ঘুরতে। দিব্যেন্দুর। এই পরিচিত আত্মীয়জনের চেয়ে ওরা ভাল যেন। এখানে রাত্রি বাসটুকুও অসহ্য।

তবু হাতে কাজ না থাকলে পরিচিত আত্মীয়জনই মনের দ্বারে ভীড় করে। তাদের কে কতটুকু কি বলেছে, বললে, তাই নিয়ে মন জাবর কাটে। অসোয়াস্তিতে ছটফট করে। ঘুম আসে না। স্থির হতে পারে কই দিব্যেন্দু।

বিচিত্রা চলে গেলে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো দিব্যেন্দু। কিছু যেন বুঝতে পারছে না। মনের মধ্যে ঠিক সাজাতে পারছে না। আগের মেয়েটি কে? চিত্রা কি? না তো। সে তো কোথাও যায় না। বাবার কাছেই থাকে। তবে কে ও? যাক্‌গে, তার কি দরকার ভাববার—হঠাৎ হনহন করে এগিয়ে গেল দিব্যেন্দু গেটের দিকে সব ভাবনাকে পিছনে ফেলে।

নবানীর সঙ্গে সেদিন মুখোমুখি হয়ে যা জেনেছিলো যা বুঝেছিলো দিব্যেন্দু, তাতে এটুকুই মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছে যে, তার জীবন আর বাঁধা নিয়মে ফিরে যাবে না। সামাজিক মূল্য সে পাবে না তার প্রিয়জনদের কাছ থেকে। জীবন চলবে শুধু ভীড়ের মাঝে—জনতার সঙ্গে থাকবে তার পরিচিতি। আদর্শের সঙ্গে সে বাস করবে ওদেরই সঙ্গে। ব্যক্তিগত গণ্ডীর জীবনে সুখ দুঃখের অনুভূতির মধ্যে বাসা বাঁধতে সে পারবে না। আর, কেউ হয়তো সুযোগও দেবে না। তাই আবার ঝাঁপ দিয়েছে সে এ ভীড়ের মাঝে। সারা দিনেরাতে শুধু কাজ, অসংখ্য কাজ। এই কাজেই তার অস্তিত্ব। আর কোন কিছুর মধ্যে সে আর বেঁচে নেই—এ সত্যটাই স্থির বলে জেনেছে দিব্যেন্দু। তাই আর যায় না নবানীদের বাড়ী। মনেও হয় না সারাদিনে একবার নবানীর কথা। শুধু গভীর অন্ধকারে বিছানায় নিশ্চুপ পরিবেশে নবানী মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যায় মনের কোণে। তখন ঘুম আসে না, বিছানাটা ভাল লাগে না। অন্ধকার ঘরে পায়চারি সুরু করে। তবু নবানী সরে না মনের কোণ থেকে। কাঁটার মত বিঁধে থাকে—

ভালবাসতে পারবে নাকি কোনদিন তাকে নবানী ? না পারবে না। শুধু হয়তো একটুকু করুণা—না, তা সে চায় না। যদি ভালো-বাসতো, যদি তার কাছে আসতো, যদি বিলিয়ে দিতো তার সঙ্গে নিজের সব স্বার্থ মানুষের কল্যাণে ; তা'হলে সার্থক হতো তাদের দুটি জীবন। সুস্থ পূর্ণ আনন্দে ভরপুর থাকতো তাদের মন। কিন্তু এ আশা, দুরাশার মত চলে গেছে—আর

ফিরেও আসবে না। ভালো কোনদিনই বাসেনি নবানী তাকে, আর বাসতেও পারবে না—আজকের দিব্যেন্দু এটাই সত্য বলে জানে।

আরো গভীর রাতে শিথিল স্নায়ুগুলো কেঁপে ওঠে দিবেন্দুর। সুপ্ত কামনা ওর চেতনে কি যেন খুঁজে বেড়ায়। মুমূর্ষুর মত কাঁপতে কাঁপতে হাত বাড়িয়ে দেয় তার সব আশার তীর-গুলোতে—নাগাল মেলে না। ব্যর্থ কান্নায় সেই সব আশাগুলো ডুবে যায়। শুধু থেকে যায় তার কাঁপনটুকু।

এদিকে কয়েকটা মাসই তো কাটলো। নবানীর সঙ্গে দিব্যেন্দুর দেখা সাক্ষাৎ নেই। চিত্রা মাঝে মধ্যে আসে। অশোকের কাছে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে চলে যায়। ক্বচিৎ কখনও দু একটা কথা বলে সামনাসামনি দেখা হলে নবানীর সঙ্গে। দিব্যেন্দুর কোন খবর পায় না নবানী। কিছুদিন আগে নবানী একটা চিঠিও দিয়েছিলো ঃ

তোমার কি হলো ঠিক বুঝতে পারছি না। অনর্থক রাগ করে আমাকে বিপদে ফেলা কেন? দেখা করবে না কেন? আমি কি এতই ঠুনকো? কি জানি, কি চোখে কি মনে আমাকে দেখছো। দেখা করো। দেখা হলে একটু স্থির দৃষ্টিতে চাইলে আমাকে বুঝতে তোমার কষ্ট হবে না। আর মনের সংশয় কেটে যাবে।

কিন্তু এ চিঠির উত্তর দেয়নি দিব্যেন্দু। উত্তরের আশাও আজ নেই নবানীর মনে—দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে সে আশার

উপসংহার টেনেছে। আর ওকে ধরতে পাবে না সে। এ সত্য নবানী অনেকদিন আগে থেকেই জেনেছে। কিন্তু মন ওকে ছাড়তে চায় কই! গভীর রাতে পুরোণো স্মৃতি ভেসে এসে কত সুখের রেশ দিয়ে যায় মনে—একলা ঘরে ওকে যেন পাকে পাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। ছেড়ে দিতে তো ইচ্ছে করে না। পাশের তুলোর বালিশটার মত মনে হয় দিব্যেন্দুকে তার। বালিশটাকে তাই নির্ভয়ে জড়িয়ে পরম আরামে মধুর স্বপ্নরাজ্যে পাড়ি দেয় নবানী।

তারপর অন্ধকার গেলে, আলো এলে কোথায় চলে যায় দিব্যেন্দু, আর তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার প্রস্তুতি! রাতের ক্লান্ত স্নায়ুগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে। মাদকতার আমেজ কাটে। তেজে, দীপ্তিতে আপন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়ায়। নরম তুলোর মত দিব্যেন্দুর সেখানে ঠাঁই মেলে না—নবানী মাথা নেড়ে সরিয়ে দেয় ওকে। স্বপ্নে মন ভরে না তখন—একটি সুস্থ জীবন্ত মানুষ চাই। দিব্যেন্দু, ও তো মরে গেছে। চোরের মত পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে জীবনের সব দিক থেকে—ওকে নিয়ে সে কি করবে! তার চেয়ে জীবন যেখানে পূর্ণতায় ভরে উঠবে সেখানেই নবানী নিজেকে নিয়ে যাবে।

তাই আজকাল যখন দাদার প্রফেসর বন্ধুটি তার মাকে মাসিমা সম্বোধন করে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপের সুযোগ খোঁজে তখন ওকে এড়িয়ে যায় না নবানী। কেন এড়িয়ে যাবে? বুদ্ধিজীবি মহলে সুনাম আছে ওর। পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি প্রচুর। স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য্যের প্রাচুর্য্য কম নয়, তাছাড়া তার প্রতি যথেষ্ট উষ্ণ আগ্রহ আছে—নারীর যা কিছু কাম্য সবই

দিতে পারে বিকাশবাবু। তাই আর এড়িয়ে যায় না। আস্তে আস্তে আমল দেয় বিকাশকে সে। পড়তে বসে নবানী নতুন করে বিকাশের কাছে।

—এত ফাঁকি দিলে পাশ করতে পারবে না তুমি—মিষ্টি ধমকের হাসি হেসে বললো বিকাশ। নবানীর ঘরে বিকাশ আর নবানী! সামনে বই খোলা, নবানী পড়ছে।

—ভালো লাগছে না মোটেই—ম্লান হাসলো নবানী।

—ভালো না লাগারই কথা। এ বয়সে এ ধরণের ধরাবাঁধা পড়া ভালো লাগে না কোন মেয়েরই। অন্য নতুন পড়ার সময় এসেছে, তারই ডাক মনের মধ্যে নয়?

নবানী চাইলো বিকাশের দিকে ঃ বেশ মুখখানি—বুদ্ধিদীপ্ত জীবন্ত মুখ। কালো, কিন্তু সুশ্রী মুখ চোখের গড়ন ঃ চোখ ফেরে না।

হেসে বললে নবানী, আপনি কিন্তু ভারী সুন্দর করে কথা বলতে পারেন!

—তাই নাকি, যাক্ এতদিন বাদে একটি মেয়ের কমপ্লিমেণ্ট পেলাম, তা কি করবে—গল্প না পড়া?

—গল্প, হেসে বই বন্ধ করলো নবানী। তারপর বললে, চলুন না বাইরে কোথাও যাওয়া যাক্, গল্পও করতে ভালো লাগবে। বিকেলে ঘরের মধ্যে বসতে ভাল লাগছে না।

—যাবে! হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বিকাশের মুখ।

—কেন যাবো না, আপনি গাড়ী করে এসেছেন তো?

—হ্যাঁ, কিন্তু দাঁড়াও, আমার সঙ্গে হঠাৎ বেড়াতেই বা যেতে চাও কেন ?

নবানী একটু অপ্রস্তুত হলো। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলো কয়েকটি মুহূর্তেই, হেসে বললে, বেড়াতে হঠাৎই যেতে হয় অচিন্তনীয় হঠাৎ আসা কারুর সঙ্গে।

—সুপার্ব ! সুন্দর বলো তো তুমি ! বেশ চলো। হঠাৎটা চিরন্তন হয়ে উঠুক না কেন, কি বলো ? আশা করবো কি সেই চিরন্তনীকে ?

—মন্দ কি ! আশা তো।

—তাহলে—

পথ বেঁধে দিলো বন্ধনহীন গ্রন্থি
আমরা দু'জনা চল্‌তি হাওয়ার পন্থী—

হাতে হাত রাখলো বিকাশ। নবানী চোখ বুজলো। গাটা শিরশির করলো। ভাবের গভীরে ভাষা মূক। নিশ্চুপ। শুধু নিঃশ্বাস।

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেলে বিকাশ হেসে বললে, উঠো, চলো। কিন্তু অনেক বেশীক্ষণ বেড়াবো কেমন, কেউ কিছু বললে স্পষ্ট উত্তর দেবো কি বলো ?

নবানী হেসে ঘাড় নাড়লো। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে বললে, চলুন।

—কাপড় ছেড়ে এসো, না থাক, এ বেশেই চলো। হঠাৎ আসার বেশ—হেসে বিকাশও উঠে দাঁড়ালো।

নবানী হাসলো মৃদু মৃদু। কিছু বললো না।

—চল, আর দাঁড়ায় না। বিকাশের পিছু পিছু নবানীও ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো।

এরপর নবানী আর বিকাশকে বিকালের দিকে একসঙ্গে দেখা যায়। ধীরে ধীরে আর একটি জীবনে আসছে নবানীর। এর-স্বাদ আস্বাদ সম্বন্ধে মনে হিসেব কষা আরম্ভ হয়েছে নবানীর—বিকাশের খুঁটি নাটি নিয়ে মনটা অসতর্ক হয়ে অনেক কিছু ভাবে। বিকাশের আলোতে দিব্যেন্দু হারিয়ে গেছে—মনেও হয় না সারা দিনের মধ্যে একবারও দিব্যেন্দুকে। শুধু গভীর রাতে, নিঃসংগ বিছানায় ছায়ার মত দিব্যেন্দু আসে, কেমন যেন হাসে। নবানী শিউরে ওঠে—কি করছে সে নিতান্ত স্বার্থপরের মত—হারিয়ে গেলে হারানো জিনিষ খুঁজতে হয়, হারিয়ে দিতে নেই। কেন সে এমনি করে হারিয়ে দিচ্ছে দিব্যেন্দুকে—না না তোমাকে হারিয়ে যেতে দেবো না। কিন্তু ওখানে দাঁড়িয়ে কে ? জীবন্ত হাসি ঠোঁটের কোনে নিয়ে নির্ভয় আশ্রয়ের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে! ডাকছে তাকে মধুর জীবনে : ও যে বিকাশ—ছায়া আর আলো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে—নবানী আড়ষ্ট হয়ে যায় কেমন নিঃসঙ্গ বিছানায়। কিছু করতে পারে না, কিছু বলতে পারে না। শুধু দুটো'দু রকম হাসি ভেসে ভেসে বেড়ায় তার মনের আকাশে। ধরতে পারে না। ধরবার ক্ষমতাও যেন হারিয়ে ফেলেছে নবানী।

আর দিব্যেন্দু জানে, নবানী ধরা ছোঁওয়ার বাইরে দাঁড়িয়ে—দূরত্ব অনেক। তার নাগাল যায় না। সেতুটাও তো ভেঙ্গে গেছে—বিশ্বাস আর নির্ভরতা নেই। তাইতো

নবানীর চিঠির কোন জবাব দেয় নি, দেখা করেনি—দেখা করে কি হবে, শুধু নিয়ম মত ক্ষমা প্রার্থনাতো। তার চেয়ে খারাপ কিছু যদি ধারণা নবনীর এসে থাকে, থাকুক। ওর চোখে তার ভালো খারাপের কোন মূল্য আজ তার জীবনচর্য্যার মূল্যমান বৃদ্ধি করবে না। না হয় রাত্রির নিঃসঙ্গতা তাকে কাঁপাবে। নাই বা বাজলো অনুভূতির তারগুলো একক আনন্দে। ব্যথা আর বেদনাই ছেয়ে থাক তার অন্তরের সমস্ত আকাশে। তা তো থাকবেই—এ সত্য, আর তো কোন উপায় নেই—দিব্যেন্দু বিছানায় শুয়ে চোখ বোঝে, ঘুম আসে না।

নীড়ের আর একটি নারী এই গভীর রাতে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মেঝেতেও ঘুমতে পারে না : সে চিত্রা। জীবনের হিসাব কষার বাইরে চলে গেছে ও আজকাল। অশোককে ঘিরে চিত্রা আর এক জগতে বাস করছে ; যেখানে জীবন মন বাস্তবের পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না—বাস্তব জীবনে সম্পুর্ণ পঙ্গু আজকাল চিত্রা। ব্যবহারিক জীবনে অকেজো হয়ে গেছে। চিত্রা আজকাল ধর্ম্ম পুস্তক, অশোকের ঘর, ধ্যান আর বাবার সঙ্গে আধ্যাত্মিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে নিজেকে। মা, ভাই-বোনেদের সঙ্গে কোন কথা-বার্ত্তা নেই বললেই চলে। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে ম্লান হাসে। উত্তর দেবার হলে উত্তর দেয়। নৈলে শুধু ঐ হাসিটুকু দিয়েই শেষ করে। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গেও কোন যোগাযোগ নেই। মার কথা মত গানের রিহার্সালেও যায়নি। বাসন্তী চটে গেছেন। বেশ দুচারটে কড়া কথাও শুনিয়ে ছিলেন পরে। কিন্তু চিত্রা কিছু বলে

নি। মনেও কোন রেখাপাত করে নি ওর। তারপর যেদিন সুচিত্রা নাচলো, সেদিনও বাসন্তী ওকে যাওয়ার জন্যে বলেছিলেন। ও শুধু ম্লান হেসে বলেছিলো, তোমরা যাও, ভীড় আমার ভালো লাগে না।

—কি যে হচ্ছিস তুই দিন দিন, না, নিজের আখেরটা একেবারে নষ্ট করলি, বাসন্তী বিরূপ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন সেদিন। চিত্রা ম্লান হেসেছিলো এ কথা শোনার পরও।

সত্যিই ওর আর বাস্তব উপকরণের প্রতি আকর্ষণ নেই। মনগড়া জগতে ও বাসা বেঁধেছে। অশোকের মত নিজেকে গড়ে তুলছে—মনে মনে তৃপ্তি পায় চিত্রা—ওর মত হতে পারলেই তো ওকে সম্পূর্ণভাবে পাবো।

অশোক এর মধ্যে একদিন চিত্রাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, আচ্ছা চিত্রা, হঠাৎ তোমার এ পরিবর্তন এলো কেন ? অনেক দিন ধরে তোমায় দেখেছি, কিন্তু এমন একটা অবস্থা তোমার আসবে এটা সত্যিই আশাতীত।

চিত্রা তার শান্ত চোখ দুটো দিয়ে অশোককে দেখতে দেখতে বলেছিলো, তোমাকে দেখে আগে কোনদিন মনে হয়নি তুমি এমনি জীবনে চলে যাবে।

—তা বটে, কখন যে মানুষের জীবনে এ সত্যের উপলব্ধি আসে, কে বলতে পারে। তবু বলবো, তোমার বোধহয় এখনও সময় হয়নি। জীবনের অনেক কিছুর স্বাদ এখনও তো তুমি পাওনি ?

চিত্রা এ কথার কোন জবাব দেয়নি! শুধু শান্ত চোখে অশোকের মুখের দিকে চেয়েছিলো। কি করে বলবে, সব

স্বাদ তো তুমি দিতে পারতে কিন্তু সেতো আর হবে না। তাই তোমার মন যে জগতে সে জগতেই যে আমাকে যেতে হবে।

—দেখো চিত্রা, মা সেদিন বলছিলেন, আমার মন এখনও চঞ্চল। সংসার-জীবনের চিন্তা নাকি আমার মনে এখনও আছে, হয়তো আছে, নৈলে মা বললেন কেন !

—আমাকে নিয়ে চলো না একদিন তোমার মার কাছে

—তোমাকে নিয়ে যাবো কিন্তু মাকে জিজ্ঞেস না করে কি করে নিয়ে যাই, তাঁর নিষেধ আছে।

—আচ্ছা তোমার এই মা কেন বারণ করেন সঙ্গে কাউকে নিয়ে যেতে ?

—আমার সাধনার বিঘ্ন হবে বলে বারণ করেন, আমি তো এখনও মাতৃরূপ দেখিনি !

—আমি যদি একলা যাই ?

—তা যেতে পারো, তবে মা যদি বুঝতে পারেন তুমি আমার পরিচিত তাহলে কিন্তু রুষ্ট হবেন ।

—কি করে বুঝতে পারবেন, তুমি শুধু তো ঠিকানাটা দেবে। এতে কি দোষ তোমার, বড় সাধিকা তিনি, কিছুতেই, রুষ্ট হবেন না, দেখো।

—বেশ তো যেও না হয়। কিন্তু কিছুদিন বাদে, এখন নয়।

—আচ্ছা।

চিত্রার কেমন যেন মনে হয় ঐ মাকে। আবছা লাগে। অশোকের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। ঠিক মা ছেলের মত, যা শোনে। কিন্তু এতো নিষেধ কেন,—কে জানে ! ঠিক ভেবে

পায় না চিত্রা। মনের মধ্যে একটা খটকা থেকে যায়। এখনও সে অশোকের মত নির্বিকার হতে পারে কই! বিশেষ করে অশোক সম্বন্ধে। ওকে ঘিরেই তো তার সাধনা।

তবু দিন দিন চিত্রা খুব নিকট ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। অশোকের সান্নিধ্যে প্রায় রোজই কাটায়। অশোকের যাবতীয় খুটিনাটি কাজও সে করে। তৃপ্তি ও পায়। অশোকও আজকাল আড়ষ্ট হয় না চিত্রা এলে। বরং নিকট আত্মীয়তার সুর থাকে ওর ব্যবহারে। চিত্রা এলে ভালই লাগে ওর। একসঙ্গে নানা ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করে, পড়ে, কখনও দুজনেই চুপচাপ বসে চোখ বুজে ধ্যান করে। চিত্রা ধ্যানেও অশোককে দেখতে পায়—জ্বলজ্বল করে মনের মধ্যে; ঐ যেন ওর দেবতা, সত্য, ইষ্ট, সব কিছুই! মনে রসের বান ডাকে—তারই আস্বাদে সারা দেহ কাঁপতে থাকে মধুর সুরে।

ছোটবেলা থেকে মনে মনে লালন করছে চিত্রা তার মধুর স্বপ্নকে—বর আর ক'নে ছোট বেলার খেলা। মাসিমার বিয়ের কথা! যৌবনের জোয়ারে তাই অশোককে প্রেমের রসে সিক্ত করেছে নিজের মনে। কামনার জাল বুনেছে। কিন্তু আজ যেন আরো গভীরে দেখতে ইচ্ছে করে তার অশোককে—মিশে যাবে সে অশোকের মনের কোনে, ধ্যানের কোণে, নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে—এই সত্যকে উপলব্ধি করতে চায় চিত্রা। তাইতো সাধনা। ভালো লাগে সব ছেড়ে এমনিভাবে ওর মুখোমুখি বসে থাকতে। বাইরের আর সব তাইতো ভাল লাগে না। ম্লান হাসির সঙ্গে সব কিছু সরিয়ে দেয়।

শুধু সরিয়ে দিতে পারে না একজনকে, সে হলো তার বাবা রাসবিহারী।

তিনি ওর মাথায় হাত বুলতে বুলতে ধীরে ধীরে বলেন, সংসারের আর সব-সুখ দুঃখের দিকগুলো ভরে নিতে হবে মা, তা নৈলে তোমার সত্যকে তুমিতো ঠিক পাবে না। নারী-জীবনে সংসার ত্যাগ, নারীকে অসম্পূর্ণ করে মা, তাছাড়া বয়ধর্ম্মকে অস্বীকার করলে ভবিষ্যতে আরো ক্ষতি স্বীকার করতে হবে।

চিত্রা কোন কথা বলতে পারে না, চুপ করে থাকে। মনে মনে বলে, কি করে বলবো, আমার কোন উপায়ই নেই আর এ জীবন গ্রহণ করা ছাড়া।

—ঈশ্বর আরাধনা করতে তোমায় বারণ করছি না, আমি খুব খুসী হয়েছি মা তোর এই ইচ্ছে দেখে। আমাদের বংশের ঠাকুর পূজার ধারাটা তবু তোর মধ্যে বেঁচে উঠছে, কিন্তু কি জানিস মা, সংসারের সঙ্গে সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে নয়, ভেতরে থেকে আরাধনা করতে হবে।

চিত্রা এবার বাবার দিকে চেয়ে বললে, ভালো লাগে না যে সংসারের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে। তুমি তো জানো না, কি নোংরা হয়ে গেছে সব! ভালো মনে ভালো করে চলার পথ নেই ওখানে।

রাসবিহারী এবার চুপ করে গেলেন। নিজের চোখে না দেখলেও আজ বেশ বুঝতে পারেন, বাড়ীটা একটা হোটেলখানার চেয়ে অধম হয়ে যাচ্ছে। কয়েক দিন আগে বাসন্তী এসেছিলেন চেক্ সহি করাতে, লক্ষ্য করেছিলেন রাসবিহারী ; কত পরিবর্তন—

স্বভাবে, চেহারায়, কথাবার্তায় সম্পূর্ণ নতুন যেন বাসন্তী! নিজের স্ত্রী বলে মনেই হয় না! যাকে একদিন কামনা দিয়ে উত্তাপ দিয়ে ভালবাসার নরম প্রলেপ দিয়ে সযত্নে লালন করতেন, তার একি অদ্ভুত পরিবর্তন! বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না এই কঠিন বাস্তব সত্যকে। শুধু টাকাটাই আজ ওর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের একমাত্র সেতু! আর কিছু নেই। এককালে যা দিয়েছে তারই পেন্‌শন নিতে আসে বাসন্তী, তাঁরই মতন সরকারী অফিসে পেন্‌শন আনার মত!

ঐ নতুন বাসন্তীই তো আজ নীড়ের সর্ব্বময় কর্ত্রী, . সুতরাং ছেলেমেয়েরা যে এমনি নিশ্চুপ হতাশার মধ্যে ডুবে যাবে, আশ্চর্য্য কি! তাই আর অযথা উপদেশ দিলেন না চিত্রাকে রাসবিহারী। তিনি তো কিছু করতে পারবেন না, অনেক দূরে চলে এসেছেন তিনি। তাছাড়া যে ডেকে নিয়ে যাবে, জোর করে জুড়ে দেবার চেষ্টা করবে, সে তো ফুরিয়ে গেছে। যা হচ্ছে হোক। ভেঙ্গে যাবে? যাক না ঃ জোড়াসাঁকোতেও এমনি ভাঙন লেগেছিলো—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন সুধু রাসবিহারী। চিত্রাও শোনে এ দীর্ঘনিঃশ্বাস—বেদনার ছোঁয়াচ লাগে তারও মনের কোনে।

—না মা আমারই ভুল, তুই যদি শান্তি পাস এতে তা হলে কিছু তো বলার নেই ঃ রাসবিহারী উপসংহার টানেন।

চিত্রা বোঝে, বাবা কত দুঃখে বললো কথাগুলো। কিন্তু তার তো সান্ত্বনা দেবার কোন উপায় নেই। তাকেও যে টেনে নিয়ে চলেছে আর একজনা। কোন উপায় নেই। সব কিছু

গুছিয়ে নিয়ে চলার দিনতো আর নেই! আজ শুধু একজনার মনে-প্রাণে মিশে গিয়ে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করার দিন যে ঃ ভাবের সাধনায় সম্পূর্ণ হতে হবে তাকে। আর কিছুতে মিশে থাকার সময় চলে গেছে। উপায় নেই!—বাবা, তুমি কিছু দুঃখ করো না, আমি ঠিক পথই বেছে নিয়েছি—চিত্রা মনে মনে বাবার উদ্দেশ্যে বললে। তারপর উঠে দাঁড়ালো। রাস-বিহারী কিছু বললেন না, চিত্রা চলে গেলে ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

বাইরে সন্ধ্যা নামছে। নীড়ে ফেরার সময়। কিন্তু কেউ তো ফেরে না! সবাই ছেড়ে যায়—আগের দিনের মত কেউ ঘন হয়ে বসে গল্পে মাতে না, হাসে না—সন্ধ্যার ঘরোয়া আমেজ আর আসে না।

এদিকে বাসন্তী আর তাল রাখতে পারছেন না। তাঁর মূলধনে ক্ষয় আরম্ভ হয়েছে—বিচিত্রা দিন দিন নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। পাত্তা করতে পারেন না ওর। সুচিটা আজকাল এড়িয়ে যায় বাজে অছিলায়। চিত্রা, সে তো আগেই সরে গেছে—মেয়েদের ওপর কর্তৃত্ব হারাচ্ছেন বাসন্তী। বিচিত্রাকে আজকাল দেখলেই তাঁর বিরক্ত ধরে—বেহায়া মেয়ে, অশ্লীলতার সীমা অতিক্রম করেছ দিনদিন! নৈলে, সেদিন কি রকম মুখভঙ্গী করে বললে, তুমি কি বলছো মা, তোমার কোন টেষ্ট নেই—হেসেছিলো বিচিত্রা উচ্চ হাসি। বাসন্তীর রাগ ধরে গিয়েছিলো ঐ হাসি দেখে—মা বলে কি একটু সম্মান দেবেনা নির্লজ্জ মেয়েটা!

কথাটা এমন কি হাসবার মত বলেছিলেন তিনি—শঙ্করের সঙ্গে অত ঢলাঢলি, তাও লুকিয়ে নয়, লোক জানাজানি হয়ে গেছে, বিয়ের কথাটা তুলেছিলেন, এটা কি এমন অন্যায় করেছিলেন! তা মেয়ে, মুখের তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিলে—বিয়ে! সে কি! ঐ আনকুথ আগ্‌লিটার সঙ্গে—মাথা খারাপ হয়েছে তোমার!

বাসন্তী রাগ সামলাতে পারেন নি, একটু অশ্লীলই হয়ে পড়েছিলেন। রাগের জ্বালায় বেশ উচ্চ স্বরেই হাত রিয়ে মুখ বিকৃতি করে বলেছিলেন, তবে ছেনালী করার কি দরকার শুনি। অত ঢলাঢলি বা কিসের?

বিচিত্রা ফোঁস করে উঠেছিলো—নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারো না।

—বিচিত্রা, চিৎকার করে উঠেছিলেন বাসন্তী।

—চেঁচালে কি হবে, তুমিই তো এ সব করতে শিখিয়েছো, লজ্জা করে না অভদ্র ইতরের মত কথা বলতে তোমার।

—মুখ সামলে কথা বল, ইতর আমি না তুই, মার সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয় এ জ্ঞানটা হারিয়েছিস পোড়ারমুখী, তা যা না বাইরেই যা—বাড়ীতে বসে এ সব নোংরামি করা চলবে না।

—মা-গিরি আমার কাছে ফলিও না, ঐ চিত্রা, সুচির কাছে ফলাও গে। তোমাকে মা বলে স্বীকার করতেও ঘৃণা হয় আমার। নোংরামি করা চলবে না, নিজের নোংরামি বন্ধ করে কথা বলো—চিবিয়ে চিবিয়ে বললে বিচিত্রা।

—বেরিয়ে যা, দূর হয়ে যা আমাব সামনে থেকে হতচ্ছাড়ী—সাপের মত ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়েন বাসন্তী।

—কেন বেরিয়ে যাবো, সহ্য হচ্ছে না বুঝি তোমার স্বরূপটা জেনে ফেলেছি বলে—পাকা কুটনীর মত চোখ পাকিয়ে তাকায় বিচিত্রা বাসন্তীর দিকে।

বাসন্তী কাঁপছেন! সহ্য হচ্ছে না। চেয়ারটায় বসে মাথা ঢাকেন। অন্ধকার ঘন হচ্ছে। একটুকুও আলোর রেশ নেই। কোথায় দাঁড়াবেন তিনি।

—বেরিয়ে যাবো বই কি, তবে তোমার সব তেজ ভেঙ্গে যাবো—বিচিত্রা বাসন্তীর বুকে পা দেওয়ার মতন করেই চলে গিয়েছিলো ঘর থেকে সেদিন।

সেই থেকেই চুপ হয়ে গেছেন বাসন্তী। বেশী কিছু বলেন না। আর আজের মত দেখেন না। মিঃ সোম এলে আলতো গল্প শেষে বেড়াতে বেরোন বটে, কিন্তু আগের মনে নয়।

মিঃ সোম দু'চার দিন বলেছিলেন, কি হয়েছে আপনার বলুন তো, এত মোরস কেন? এ বয়সে এ ভাবটা তো ভাল নয়, আর ক'দিনই বাঁচবো বলুন আমরা,—হাসি আর আনন্দের মধ্যে কাটানোই কি ভাল নয়?

বাসন্তী ম্লান হাসেন। কিছু বলেন না। মিঃ সোমের সঙ্গ ভাল লাগছে না। এই বিপত্নীক ভদ্রলোকটি তাঁর স্বামীর পুরোণো বন্ধু। সেই সূত্রেই ঘনিষ্ঠতা। আর এককালে ভালোও লাগতো বাসন্তীর মিঃ সোমকে। আজ এই প্রৌঢ়ত্বের চত্বরে বসে যৌবন-দিনের চাপল্য দিয়ে সময় সময় পরস্পরকে

ভিজিয়েছেনও। কিন্তু আজ যেন ভাল লাগে না মিঃ সোমকে। একা একা থাকলে, এ কথা মনে হলে, অসোয়াস্তি অনুভব করেন বাসন্তী—মাথা নাড়েন, চুল ছেঁড়েন আর গভীর রাতে কান্নায় ভাসিয়ে দিয়ে শান্তি খোঁজেন। স্বামী কথা মনে হলে লজ্জায় কুঁকড়ে ফেলেন নিজেকে। কোথায় একটা বাধা আছে। কিছুতেই যেতে পারেন না স্বামীর ছোট শান্তি ঘেরা নীড়ের কাছে। তবু চলেছেন বাসন্তী—প্রতিদিন নিয়ম মাফিক সব ঠাট বজায় রেখেছেন। বিচিত্রা ছাড়া সবাইয়ের কাছেই আগের কর্ত্রীর-সম্মান রক্ষা করার ক্ষীণ প্রচেষ্টা আজও বর্তমান বাসন্তীর ব্যবহারিক জীবনে।

এ বাড়ীর ছোট মেয়ে সুচিত্রা, তারও রূপান্তর হয়েছে। ওর সদ্য জোয়ার জাগা যৌবন-চঞ্চলতা স্বাভাবিক মিষ্টতা হারিয়ে ফেলেছে—যা ওর দাদা দিব্যেন্দু দেখে মুগ্ধ হয়েছিলো, সে রেশটুকু খোয়া গিয়েছে। রেণ্টুর সঙ্গে ও নাচ শিখতে যেতো। প্রথম প্রথম ভাল লাগতো না। মাকেও বলেছিলো সুচিত্রা, রেণ্টু বাবু লোক ভাল নয়। মা ধমক দিয়েছিলেন, ফাজিল হচ্ছো যে বড়।

তারপর নাচের তালে তালে রেণ্টু এগিয়ে আনে সুচিত্রাকে উষ্ণ লাভার স্রোতের ধারে—মানস সরোবরের মত মনে হয় ওর। সুচিত্রা প্রথম সেই অমৃতের আস্বাদ পায় ঐ উষ্ণ দুর্গন্ধ লাভার স্রোতে। ঝাঁপও দেয়। পুড়ে যায় আগের সুচিত্রা।

এ যেন অন্য মেয়ে—নির্জন পথ বেয়ে রেণ্টুর কাঁধে ভর দিয়ে যেতে বেশ লাগছিলো সুচিত্রার সেদিন।

—কেমন ভাল নয়—বুকের কাছে চাপ দিলো রেণ্টু।

—এই সুড়সুড়ি লাগে যে! আচ্ছা, আগে কোন মেয়ের সঙ্গে এমনি করেছো তুমি? বেশ আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে সুচিত্রা।

—না না পাগল তুমি, তুমিইতো প্রথম, ভালবাসি যে তোমায়—চলতে চলতে কাছে আসে রেণ্টু। একটু বেঁটে, শক্ত সমর্থ দেহ রেণ্টুর। লম্বা লম্বা ঘাড় পর্যন্ত কোঁকড়ানো চুলওলা নাচিয়ে রেণ্টু ভালবাসার কথাটা সব মেয়েকেই বলে প্রথম ঘনিষ্ঠতায় এলে। মেয়েদের সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি ঘনিষ্ঠ হতে পারে ও। বয়স কত বোঝা ভার—এ পাড়ায় প্রায় প্রত্যেকটি রান্নাঘরে ওর যাতায়াত আছে। নাচ দেখিয়ে, কথা বলে, হাসিয়ে, টুকটাক ফাই-ফরমাস খেটে, পঞ্চাশ থেকে পাঁচ বছরের মেয়েদের আপন রেণ্টু মেয়েলী ব্যাপারে ওর পরামর্শ মূল্য পায়।

—ঠিক বলছো তো, আমার কিন্তু সন্দেহ আছে—তীর্যক দৃষ্টির সঙ্গে একটু হাসে সুচিত্রা।

—ধ্যেৎ, আরো কাছে টানে রেণ্টু সুচিত্রাকে। সুচিত্রা বাধা দেয় না। ভাললাগে তার। শুধু রাস্তার চারদিকে তাকিয়ে বলে, কেউ যদি দেখে ফেলে?

—দূর্! এত রাতে কে দেখবে!

—আচ্ছা আমাদের ফাংসান্তো পরশু না, কিন্তু আমার বড় ভয় করছে যে, একগাদা লোকের সামনে—!

—কোন ভয় নেই, আমি তো আছি, তাছাড়া তুমি তো বেশ ভালই নাচছো, আমি বলছি তুমি দেখে নিও, খুব সুক্খেতি

পাবে। নাও এখন একটু পা চালাও দেখি, তোমায় যদি কেউ কিছু বলে বলবে, ফুল রিয়েৰ্শাল তাই দেরী হলো।

—এই কিছু হবে না তো—হঠাৎ ভয় পায় যেন সুচিত্রা।

—না না, আমি কি কাঁচা লোক নাকি! কোন ভয় পেও না, কিস্সু হবে না, কিন্তু কবে আবার, লক্ষ্মীটি না করো না—মুখটা এগিয়ে নিয়ে যায় রেণ্টু।

—উঁ-হু, এ কি হচ্ছে!

—বল না কবে?

—না, হুঁ, আচ্ছা সে হবেখন, এই ছাড়ো বাড়ীর কাছে এসে গেছি যে!

—ঠিক তো?

সুচিত্রা ঘাড় নাড়ে। কিছু বলে না।

সামনে নীড়ের গেট। হঠাৎ কেমন সঙ্কোচ আসে সুচিত্রার মনে। লজ্জা আর ভয়ে শিরশির করে মন। স্থির থাকতে পারে না। হঠাৎ ছুটে গেটের ভিতর দিয়ে অন্ধকারে মিশে যায়।

রেণ্টু হকচকিয়ে যায় সুচিত্রার এই ব্যবহারে। থমকে দাঁড়ায় একটু। তারপর মনে মনে হাসে: মেয়েদের মন কিনা!

তারপর এম্পায়ারের 'শো' কেটে গেল। সত্যিই সেদিন চমক লাগিয়েছিলো সুচিত্রা—নতুন বেশে, নৃত্যের ভঙ্গিমায়, সুন্দরী তন্বীর দেহ-হিল্লোলে চমকে গিয়েছিলো সেদিনকার দর্শকবৃন্দ। বিশেষ করে শঙ্কর। এর আগে অনেকবারই দেখেছে ও সুচিত্রাকে। কিন্তু এত রূপ আর সুগঠিত দেহ-

সৌষ্ঠব কোনদিন চোখে পড়েনি। নতুন করে দেখলো শঙ্কর সেদিন সুচিত্রাকে, আর এ দেখার রেশ থেকেই গেল—কাটলো না।

দিন কয়েক বাদে শঙ্কর এলো নীড়ে। বিচিত্রা বেরিয়েছে, বাসন্তীও বেরিয়েছেন। ভোলাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো শঙ্কর, ছোট দিদিমণি বাড়ী আছে কি ?

—সুচিদিদি, বসুন দেখছি, ভোলা চলে গেল।

শঙ্কর বসলো। কেমন অস্থির চিত্ত ; মনটা স্থির হচ্ছে না। বিচিত্রা যেন আর তার চাহিদা মেটাতে পারছে না। ভাল লাগে না ওকে। আর সুচিত্রা—কে জানে কি ধরণ এর, টাকার ডালি দিলেও কি বরণ করবে না—উঠে দাঁড়ালো শঙ্কর। তারপর সামনের বড় আয়নাটার সামনে এগিয়ে গেল—কিন্তু চেহারাটা যে বিশ্রী ! তবু টাকার কাছে—কিন্তু নতুন যে—নতুন মন, দেহ, যৌবন—টাকাতে কি আটকা পড়বে—কেন পড়বে না ! যুগটা টাকার—একটু যেন স্বস্তি অনুভব করে শঙ্কর মনে মনে। তারপর কোটের পকেট থেকে জড়োয়ার একটা বাক্সো বের করে দেখে হাসলো একটু।

—আরে আপনি, আমি ভেবেছিলাম আর কেউ—সুচিত্রা হাসলো একটু কথা শেষে।

—কেন, আমি বুঝি তোমার ভাবনার লিষ্ট থেকে বাদ পড়েছি। তা পড়াটাই উচিত, কি বল ?

—কি বলছেন আপনি, আমি কি তাই বলেছি !

—না, মানে তুমিতো এখন সমাজের রীতিমত বিখ্যাত মহিলা ! সে যাক্, এ দীন ভক্তের এই সামান্য উপহারটুকু যদি—

—বাঃ ভারী সুন্দর তো, তা দিদি এক্ষুণি হয়তো আসবে, বসুন না নিজে হাতে দিয়ে যাবেন। এই বলে লুব্ধ দৃষ্টিতে জড়োয়া হারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকলো সুচিত্রা।

—দিদি কেন? ওটা তোমার জন্যেই—হাসলো শঙ্কর সুচিত্রার দিকে চেয়ে।

—আমার! বিস্ময়ে আর আনন্দের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো শঙ্করের দিকে সুচিত্রা।

—হাঁ গো তোমার, তোমার সেদিন নাচের পুরস্কার! কেমন, তোমার ভাবনার লিষ্ট থেকে বাদ যাবো না তো?

—তা কেন, ভাবি তো, আর এখন থেকে অনেক ভাববো আপনাকে, যাক্ বেড়াতে নিয়ে যাবেন? ভাল লাগছে না বাড়ীতে একা একা বসে থাকতে।

—বেড়াতে, নিশ্চয় নিয়ে যাবো, কোথায় যাবে ডায়মণ্ড-হারবার, না ব্যারাকপুর গান্ধী ঘাট, কোথায়?

—ডায়মণ্ডহারবার চলুন, কিন্তু এই অবেলায়, ফিরবো কখন?

—নাই বা ফিরলে, আমাকে কি ভয় করে?

—না ভয় করে নাতো, বাড়ীর বাইরে রাততো কখনও কাটাইনি না বলে কিনা।

—কটায় ফিরলে চলবে?

—ম্যাক্সিমাম এগারোটা।

—ও, কিন্তু এখন যাত্রা করলে হয়—শঙ্কর হঠাৎ স্ফূর্তিতে না-ধরানো সিগারেটটায় টান দিলো।

হাসি পেলো সুচিত্রার, ও বললে, দেশলাই নেই নাকি ?

—দেশলাই, আছে তো, ও হ্যাঁ তাইতো, এটা ধরাণোই হয়নি, কি মুস্কিল —দেশলাই জ্বালালো শঙ্কর।

—আমি তাহলে কাপড়টা বদলে আসছি।

—হ্যাঁ এস আর ঐ হারটাও পরে এসো।

এক ঝলক হাসি উপচিয়ে দিয়ে সুচিত্রা চলে গেল নাচতে নাচতে। হঠাৎ খুসীতে উপচিয়ে পড়ছে ও।

এই প্রথম ওর জীবনে বাইরের পুরুষের কাছ থেকে পাওয়া মূল্যবান উপহার। নিজের গহনা পরতে আর রাখতে কত আনন্দ। এইটুকুই তো লাভ। শাড়ী-গহনার লোভ সুচিত্রার অনেক দিনের। বিশেষ করে বিচিত্রার ইদানীং কার শাড়ী গহনার জৌলুস ওর চোখকে ধাঁধাঁতো, আর মনে মনে ঈর্ষা করতো সুচিত্রা। কিন্তু কেউ তো দেয় নি কিছু ওকে। সেই বাবার দেওয়া রুলি দুটো ছাড়া আর কোন গহনা নেই। তাই হঠাৎ-আসা এই উপহার ওর মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন করলো।

মন্দ কি—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হারটা গলায় পরে হাসলো একটু সুচিত্রা—কিন্তু মেজদি যদি কিছু মনে করে, যদি কিছু বলে—মুখটা হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে ওঠে সুচিত্রার। কিন্তু পরক্ষণেই মুখে বিদ্বেষ আর উপেক্ষার চিহ্ন ফুটে ওঠে। ঠোঁট উলটিয়ে নিজের মনেই বলে ওঠে, বয়ে গেল, কি বললো না বললো। তারপর নরম শাড়ীর আঁচলটা কাঁধে ফেলে পাউডার পাফ্ মুখে একবার বুলিয়ে প্রসাধন সাঙ্গ করলো সুচিত্রা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শঙ্করের কালো গাড়ীটা নতুন অতিথিকে সম্পূর্ণ আরামে মুড়ে নিয়ে এগিয়ে চললো নীড় ছেড়ে। বিচিত্রাও

বেরিয়ে ছিলো এমনি করে, এই গাড়ীটা সেদিন খুব আরাম দিয়েছিলো বিচিত্রাকে যেমন আজ সুচিত্রাকে দিচ্ছে। ঐ সুচিত্রার মতনই এলিয়ে দিয়েছিলো সে নরম কুশনে। ফিরেও এসেছিলো বিচিত্রা ; রূপ ঠিকই ছিল ; রূপান্তর হয়েছিলো শুধু মনের।

তবু ও বিচিত্রা নয়, সুচিত্রাই। তাই পেছুনটা এখনও ছাড়াতে পারলো না। রেণ্টুর সঙ্গে প্রায় রোজই সংযোগ রক্ষা করে। নাচের প্রস্তুতির শেষে রেণ্টুর নির্জন ঘরে রেণ্টুর গায়ে গা জড়াতে ভাল লাগে, আমেজ আসে—বেশ লাগছে এখন সুচিত্রার জীবনের এই দুটো ধারায় একই সঙ্গে ভাসতে। একটা ছেড়ে আর একটায় যেতে পারে না সুচিত্রা।

বাড়ীর ভয়টা এখনও যায় নি। তাই সেদিন রাতে ছোড়দাকে দেখে ছুটে পালিয়ে ছিলো অন্ধকারে। ছোড়দা আর মেজদাকে বড় ভয় করে সুচিত্রার। মার মত যদি কিছু বলতো, তা'হলে এত ভয় হতো না। কিন্তু কিছু বলে না অথচ কি রকম ভয় করে!

সেদিন বিকেলে সুচিত্রা আর শঙ্কর বৈকালীন ভ্রমনে বেরুবে বেরুবে করছিলো। বাড়ীতে বিচিত্রা আর বাসন্তীও ছিলেন। আজকাল আর বাধে না শঙ্করের বাসন্তীর উপস্থিতিতে সুচিত্রার সঙ্গে আলাপ করতে।

বাসন্তী তাঁর সৌখীন সৌজন্য আলাপন সেরে অনেকখন আগেই চলে গিয়েছিলেন। চা খাওয়াও হয়ে গিয়েছিলো সুচিত্রা-দের, হঠাৎ ওপর থেকে বিচিত্রা দ্রুত নেমে এলো বাইরের আচ্ছাদিত চাতালটায়। সুচিত্রা বিচিত্রার দিকে চাইতে বিচিত্রা বললে, উপরে একটু শুনে যাতো—স্বর ওর গভীর।

—এই যে তোমার তো দেখাই পাওয়া ভার, Now how do you do—শঙ্কর দাঁত-ভেংচানো মিচ্‌কি হাসি হাসলো।

বিচিত্রা কোন জবাব দিলে না। শুধু কটুকটে চোখে দেখলো শঙ্করকে, তারপর সুচিত্রার দিকে ফিরে বললে, আর সময় নষ্ট করার মত সময় আমার নেই, চ ওপরে—শঙ্করকে উপেক্ষা করে পা বাড়ালো বিচিত্রা।

—একটু ভদ্রতা আশা করেছিলাম মিস বোস।

পিছন ফিরেই বিচিত্রা বললে, যোগ্য লোকের সঙ্গে যোগ্য ব্যবহারই আমি করে থাকি Thats enough for you.—বিচিত্রা আর দাঁড়ালো না।

শঙ্কর অপমানে জ্বলে উঠলো, সুচিত্রাকে বললে, দেখলে সুচি তোমার দিদির ব্যবহারটা।

—ছোড়দিটা সত্যিই একটা ইতর হয়ে যাচ্ছে, যাই দেখি কি বলে, নৈলে এখনি অভদ্রের মত চেঁচাবে, আপনি বসুন এখুনি আসছি। সুচিত্রা চলে গেল।

শঙ্কর বসে বসে রাগে ঠোঁট কামড়ায়। বিচিত্রার আগর-ওয়ালার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা শঙ্কর সহজভাবে যেমন নিতে পারেনি, তেমনি বিচিত্রা তার বোনের সঙ্গে শঙ্করের মেলা-মেশাটা পছন্দ করে না। এ নিয়ে ওদের দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি না হলেও নীরব যুদ্ধ চলেছে।

সুচিত্রা বিচিত্রার ঘরে যেতেই দেখলো, ছোড়দি গম্ভীর হয়ে বসে রয়েছে আয়নার সামনের চেয়ারটায়।

—কি বলবে বলো—সুচিত্রা চোখ দুটো কুঁচকে খাটে বসলো।

—বিচিত্রা ওর দিকে ফিরে গম্ভীর অভিভাবিকার স্বরে বললে, ঐ ইডিয়ট লোফারটার সঙ্গে মেশা কি ভাল হচ্ছে ?

—এ কথা বলার জন্যে তুমি ডাকছিলে ? এ জানলে তো আসতাম না—সুচিত্রা উঠে দাঁড়ালো।

—সুচিত্রা—কর্কশ চিৎকার করলো বিচিত্রা।

—চিৎকার করো না, তাতে দিদিগিরি মর্য্যাদা পায় না।

—খুব যে চেটাং চেটাং কথা শিখেছিস মুখপুড়ী। যা বলছি তাই করতে হবে, ওর সঙ্গে মিশবে না।

—গাল দিও না ছোড়দি, আর আগেই বলেছি তোমাকে, মিশি না মিশি সেটা আমার ইচ্ছে, তোমায় নাক গলাতে হবে না। নিজে কি করছো না করছো তার হিসেব করো, আমার কথায় থাকাটা আমি পছন্দ করি না—বেশ ধীরে ঠাণ্ডা স্বরে বললে সুচিত্রা। এতটুকু জড়তা এতটুকু রাগের প্রকাশ পেলো না ওর স্বরে।

—ও এত দূর বেড়েছো! মার আস্কারাতেই বোধ হয় ? আচ্ছা ঃ ঠোঁট কামড়ায় বিচিত্রা।

—আস্কারা তুমিও কি কম পেয়েছো ; মেড়ো-খোঁট্টাও বাদ দাও না—।

—সুচি, মুখ সামলে কথা বল্‌লো বলছি—বিচিত্রা ছুটে এসে সুচিত্রার চুলের মুটি ধরলো।

—চুল ছেড়ে কথা বলো বলছি, নৈলে ভাল হবে না। বিষ নেই কুলোপানা চক্কর। রেকে-ঢেকে আর কতদিন চালাবে, জানতেতো আমার কিছু বাকি নেই—রেগে উঠেছে সুচিত্রা এবার। সংযম হারিয়ে গেছে ওর।

হঠাৎ বিচিত্রার উত্তেজনা যেন নিস্তেজ হয়ে পড়লো—হাত খসে পড়লো সুচিত্রার চুল থেকে, সরে গেল খাটের কাছে। ধীরে বসলো শুধু, কিছু আর বললে না।

—ঢাকতো বেজেছে আর কেন, এবার গেলেই তো হয়—সুচিত্রা দাঁড়ালো না আর, চুলটা ঠিক করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এদিকে চিত্রা আর ধৈর্য্য ধরতে পাচ্ছে না।

বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে কিন্তু অশোক আজও চিত্রাকে কালীঘাটে মার কাছে নিয়ে যায় নি। চিত্রা জিজ্ঞেস করলেই অশোক আগের মত বলে, এখন অনুমতি পাই নি। ভাল মনে হয় না চিত্রার, কেমন একটা সন্দেহ এনে দেয় যেন অশোকের এড়ানো ভাবটা।

চিত্রা চুপ করেই যায়। কিন্তু মনের মধ্যে কাঁটা বেঁধার মত খচখচ করে—যাওয়ার অনুমতি কি শুধু তার বেলায়! কে জানে, ভেতরে কি ব্যাপার চলছে—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চিত্রা। মনের মধ্যে এ ছাড়া আর কোন সন্দেহ নেই ওর।

দুপুরে পড়তে পড়তে অশোক হঠাৎ বললে, আর ভাল লাগছে না পড়তে, বড্ড মাথাটা ধরেছে চিত্রা।

—তাইতো, তা টিপে দেবো মাথাটা, শুয়ে পড় তুমি—চিত্রা বললে দরদভরা স্বরে।

—টিপে দেবে। তা দাও—অশোক শুয়ে পড়লো কম্বলটায়।

—মাথাটা আমার কোলে দাও না।

চিত্রার মুখের দিকে অশোক চেয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। কি দেখলো যেন। তারপর খুব আস্তে মাথাটা চিত্রার কোলে রাখলো।

চিত্রা আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। আরামে চোখ বোজে অশোক।

—আচ্ছা চিত্রা, আমার সাধনা কি সিদ্ধিলাভ করবে না—স্বরটা করুণ অশোকের।

—কেন করবে না, তুমিতো তোমার সব কিছু দিয়েছো, তোমার মধ্যেতো মিথ্যে কিছু নেই, বিশ্বাস আর ভক্তি তোমার অগাধ; নিশ্চয় তুমি তাঁকে পাবে ঃ দরদে ভিজে আসে চিত্রার স্বর। হাত দিয়ে আদরের প্রলেপ দিয়ে চলে ও অশোকের কপালে।

—কিন্তু আমার মন বলছে আমি অন্যায় করেছি। তোমায় বলিনি চিত্রা, রাতে ঘুমুলে আমাকে কে চাবুক দিয়ে মারে—সেকি যন্ত্রণা! আমি পারি না যে সহ্য করতে, কেন, আমার কি দোষ? বল না কি দোষ করেছি—হঠাৎ ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠলো অশোক।

চিত্রা হতবাক্ হয়ে যায়। এ কি—কেন এমন হলো ওর। ও কি শেষটায় পাগল হয়ে যাবে—শিউরে ওঠে চিত্রা।

—ও কিছু নয়, ওর জন্যে মন খারাপ করো না লক্ষ্মীটি, মনে বল নিয়ে এস, স্থীর হও—চিত্রা ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে মাথায় হাত কপালে বুলিয়ে দেয়।

অশোক ফোঁফাঁলো আরো কিছুক্ষণ। তারপর এক সময় চুপ করলে চিত্রা বললে, মাথাধরাটা ছাড়েনি?

—না এখনও টিপ টিপ করছে মাথাটা, কিন্তু এবারতো উঠতে হয়, প্রায় পাঁচটা বেজে গেছে, তোমায় কষ্ট দিলাম নাতো—অশোক উঠতে উঠতে বললো।

—কষ্ট! না তো—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে ম্লান হাসলো চিত্রা।

বিকেল হলেই কেমন যেন আলগা আলগা ব্যবহার করে অশোক তার সঙ্গে; দূরত্বের সুর আসে ওর কথায়, ব্যবহারে—বড় কষ্ট হয় চিত্রার এই সময়টা। এতক্ষণ ধরে তার মন যা গড়লো, দমকা বাতাস তা ভেঙ্গে দিয়ে গেল। এমনি প্রায় প্রতিদিনই হয়। তবু তো আশা মানে না।

চিত্রা অন্যমনা হয়ে পড়েছিলো। ইতিমধ্যে অশোকের কাপড় ছাড়া হয়ে গিয়েছিলো, যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ও চিত্রাকে বললে, আমি আসি তা হলে।

চিত্রা অশোকের দিকে তাকিয়ে দেখলো—কিছুক্ষণ আগের কান্না-ভেজা ব্যথা-ভরা মুখ কোথায় লুকিয়ে পড়েছে। মুখ চোখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সজীব চঞ্চলতায় মুখর ওর সমস্ত দেহমন—দেখতে ভালো লাগলো চিত্রার। এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করে আস্তে করে চিত্রা বললে, এস

—অশোক আছিস নাকি ঘরে—বিজয়া দেবী দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

—হাঁ আছি, ঘরে এস না।

বিজয়া দেবী ঘরে ঢুকে চিত্রাকে দেখে বললেন, তুই কতখন এসেছিস মা, আমি তো জানতে পারিনি।

—তুমি ঘুমুচ্ছিলে যে, ডাকিনি তাই—হাসলো চিত্রা বিজয়া দেবীর দিকে চেয়ে।

—তুই কি বেরোচ্ছিস নাকি—অশোকের দিকে চেয়ে বললেন বিজয়া দেবী।

—হ্যাঁ বেরোচ্ছি—মার দিকে চাইলো অশোক।

—একটা পরামর্শ করার ছিলো যে।

—পরামর্শ! আমার সঙ্গে—হাসলো অশোক।

—হাসিস নে বাপু, যা হচ্ছিস, কিন্তু সব তো হেসে উড়িয়ে দিলে চলবে না। হ্যাঁ, যা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম, হ্যাঁরে বিকাশ ছেলেটি কেমন?

—কেন ভালই তো। অধ্যাপক, অর্থবান, রূপবান; অনেক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি, কিন্তু ব্যাপারটা কি?

—ব্যাপারটা বিয়ের।

—কার সঙ্গে?

—তোমার ডুম্ব আইবুড়ো বোনের সঙ্গে। ডুজনে তো কর্তার কাছে গিয়ে বলেছেন, আমাদের বিয়ে দিয়ে দিন, নৈলে নিজেরাই বিয়ের ব্যবস্থা করবেন—বেহায়া কালামুখী মেয়ে কোথাকার—মুখটা বিকৃত করে বলে উঠলেন বিজয়াদেবী।

চিত্রা চমকে গেল। অশোক হাসলো মৃদু। নবানীর প্রতি বিরূপ মন্তব্য কেন বুঝলো অশোক: খুব লেগেছে মার। আর সেই সঙ্গে বিষণ্ন পরিশ্রম-ক্লান্ত ছিপছিপে ফরসা সুন্দর একখানা মুখ অশোকের চোখের সামনে ভেসে উঠলো—দিব্যেন্দু! কিন্তু সে কোথায়? দীর্ঘদিন অনুপস্থিত কেন? এই সামনে দাঁড়ানো

মার কোলে শোয়ার জন্যে কি ঝগড়াই করেছে দু'জনে। দিবুকে শুতে দিতো মা খুব বেশী করে, মনে পড়ে গেল অশোকের হঠাৎই—অনেক আশা ছিলো মার দিবুকে কাছে ধরে রাখার—কিন্তু সে আশা তো ভেঙ্গে দিয়েছে যাকে দিয়ে বেঁধে রাখবেন সে নিজেই।

হঠাৎ অনেকদিন বাদে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো অশোকের বুক ঠেলে। ম্লান হেসে মার দিকে চেয়ে বললে, ওরা যখন চায় পরস্পরকে তখন বিয়ে দিয়ে দাও, আমি যাই তাহলে।

—যাবেই তো, বললেই কি দাঁড়াবে তোমরা—হঠাৎ চলে গেলেন বিজয়া দেবী তাড়াতাড়ি। হয়তো আর সামলাতে পারতেন না।

মাসিমা চলে গেলে চিত্রা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অশোকের দিকে চাইলো। কি যেন জিজ্ঞাসা রয়েছে ওর চোখের ভাষায়—অশোক দেখলো।

—কিছু বলবে ?

ঘাড় নাড়লো, কিছু বলবে না চিত্রা।

—আমি যাই চিত্রা, মা হয়তো রাগ করবেন—আবার অশোক কেমন হয়ে গেল। অপ্রকৃতিস্থ, অস্বাভাবিক অস্থির—কেন, কেন, কেমন হবে ও—কে এই যাদুকরী মা-রূপী ডাইনি—হঠাৎ শরীরের ভেতরটা জ্বালা করে ওঠে চিত্রার।

অশোক আলনা থেকে চাদরটা নিয়ে ঘর থেকে বেশ ব্যস্ত হয়েই বেরিয়ে গেল।

চিত্রাও উঠে দাঁড়ালো। অনেকদিন বাদে রক্ত-মাংসের নারীর জমানো ঈর্ষা ওর মনের মধ্যে জ্বলে উঠেছে—আর ধৈর্য্য ধরতে পারছে না চিত্রা। বেশ ব্যস্ত হয়েই ও অশোকের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দিব্যেন্দু চলেছে চৌরঙ্গীর চওড়া ফুট দিয়ে অনেক মানুষের ভীড়ে। সন্ধ্যে উতরেছে একটু আগে। নানান বিপণীর নীল সবুজ হলদে লাল নিওন আলোগুলো জ্বলছে নিবছে ঘুরছে। ডাকছে সকলকে। ওপাশে সবুজ মাঠে সাদা সাদা মানুষ এলোমেলো পাক খাচ্ছে। বসে আছে কেউ একা একা আকাশ পানে চেয়ে। কেউ বা আড্ডার চত্তর সৃষ্টি করে সান্ধ্য আমেজ করছে। আরো একটু দূরে, একটু বেশী অন্ধকারে দুজনে একা-একা মেয়ে-পুরুষে নিভৃতির সুযোগ নিচ্ছে—মিষ্টি ভেজা-ভেজা আলাপ করছে। রসালো মাটির মানুষের নীরস জীবনে রসসিক্ত করার নানান প্রচেষ্টা চলছে—কিন্তু গুমোটে ফিরে তো আসতেই হবে—দিব্যেন্দু দেখতে দেখতে এই কথাই ভাবছিলো। তবু তো লাভ এটুকু .এদের। কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর বাড়ীর সামনে কিছুক্ষণ আগে টিয়ার গ্যাস খেয়ে যারা পালিয়ে এলো সেই মেয়ে-পুরুষের দল, তারা কি করবে ? হয়তো স্বার্থপরের মতই কিছু পাবার জন্যে জনতা থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়বে। তারপর মৃত্যুর মুখোমুখি দেখা হবে সবার সঙ্গে। তবু চেষ্টা—হাসি পেলো দিব্যেন্দুর। নিজে নিজেই হাসছে সে, খেয়াল হতেই সামলে নিলো—ছি ছি কি ভাববে লোকে, পাগল বলবে যে!

—দিব্যেন্দু বাবু যে!

জামাতে টান পড়তে থমকে দাঁড়ালো, বিরক্ত হলো দিব্যেন্দু।

—কি চিনতে পারছেন না নাকি?

—চিনবো কি করে বলুন! এই কিছুদিন আগে যাকে দেখলাম, তার সঙ্গে তেমন মিল তো পাচ্ছি না—হাসলো দিব্যেন্দু।

—সেতো অনেকদিন, প্রায় বছর খানেক আগে, একটা বছর কি কম! কত বিরাট পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে আর আমি তো একটা সাধারণ মেয়ে।

—চেহারা ভালই করেছেন দেখছি, সাজগোজও দামী, আশা করি আপনার সুদিন, দিব্যেন্দু একটু জোরই হাসলো অণিমা বোসের দিকে চেয়ে।

সত্যিই চেহারা ভাল হয়েছে অণিমা বোসের। সেই রোগা হাড় জিরজিরে রক্তশূণ্য পাঁশুটে শরীর নেই; সারা শরীরে মাংস লেগেছে। কালোর ঘোরটা একটু কেটে গেছে, অনেকটা শ্যামল রঙ। মুখেচোখে লালিত্যের আভা ফুটেছে। চোখটা জীবন্ত, বুদ্ধিতে প্রখর—বহু আগের কমরেড অণিমা বোসের চোখটাই ফিরে পেয়েছে যেন অণিমা—দিব্যেন্দুর ভাল লাগলো।

—চলুন কোথাও বসি, কিন্তু কি করছেন বলুনতো আপনি! খান নি নিশ্চয়? চলুন দেখি—অণিমা দিব্যেন্দুর হাতে টান দিলো।

—চলুন। এগিয়ে গেল ওরা লেড'লর দোকান ছাড়িয়ে।

পথের মানুষ নিয়েই ব্যস্ত দিব্যেন্দু। ওর ব্যক্তিগত জীবনের একটি মধুর অধ্যায় আজ যে শেষ ছেদ টানার পর্য্যায় এসে দাঁড়িয়েছে এ খবর তো জানে না দিব্যেন্দু; পথের মানুষে মিশে গেছে। পথের মানুষ নিয়ে ওর সংসার। ব্যক্তিগত জীবন ওর ঘুমের কিছুক্ষণ আগে বিছানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঘুম শেষে নীড় ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে; আর আসে গভীর রাতে। দিনের খাবার সময়েরও ঠিক নেই; কোনদিন খায় কোনদিন খায় না ও। খোঁজও রাখে না কেউ আজকাল। আজ পকেটে একটা পয়সাও নেই দিব্যেন্দুর, হেঁটেই ফিরছিলো। পথে অণিমা বোস দিব্যেন্দুকে আবিষ্কার করলো।

—সত্যি দিব্যেন্দু বাবু, আপনি কিন্তু ভাল করছেন না।

—ভাল-মন্দের বাইরে চলে গেছি অণিমা দেবী—দিব্যেন্দু টেবিলের উপর কোনুই ভর দিয়ে হাসলো একটু। বেঙ্গল রেষ্টুরাণ্টের ভিতর দিকের বাড়ীটার একটা খোপে বসেছে ওরা সবুজ পর্দার আড়ালে।

—ভাল মন্দের বাইরে। ভীষণ রাগ ধরছে আপনার ওপর সত্যিই। এইভাবে না খেয়ে, না দেয়ে শরীর নষ্ট করলে কতদিন বাঁচবেন, আর কাজই বা করবেন কি করে—চোখ টেনে বললো অণিমা, দরদের আভাসও যেন থাকে একটু স্বরে।

ভালো লাগলো দিব্যেন্দুর এ রকম মিষ্টি ঘরোয়া ধমক শুনতে—অনেককাল শোনেনি নিকট কোন আত্মীয়ার কাছ থেকে। নবানী এককালে এমনি ভাবেই যেন বলতো তাকে, মনে পড়ে গেল দিব্যেন্দুর।

দিব্যেন্দুকে চুপচাপ দেখে অণিমা বললে, কি ভাবছেন ?

—ভাবছি, কই নাতো। কি বলছিলেন যেন, কতদিন আর বাঁচবো। কি হবে বেঁচে ? কি লাভ আছে বেঁচে বলুনতো, যে বাঁচবো—দিব্যেন্দু বললে অণিমার দিকে চেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো। দিব্যেন্দুর ভেতরের মানুষটা হঠাৎই প্রকাশ হয়ে পড়লো অণিমা বোসের কাছে। নিরাসক্ত দিব্যেন্দু খুব তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাচ্ছে।

—সে কি ! বাস্তব আশাবাদের প্রচারকের মুখে-মনে নিরাশার সুর কেন, কিছু তো বুঝতে পারছি না ? আচ্ছা আপনার মা বাবা আছেন ?

—হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন বলুন তো ? হ্যাঁ তাঁরা জীবিত।

—তাঁরা কি আপনাকে কিছু বলেন না, মানে শাসন করেন না—হাসলো অণিমা একটু।

—এলে গেছেন কি না—দিব্যেন্দু হাসে।

খাদ্য এলো। বেশ—ভালোই। মাংসের রোস্ট, রুটি।

—এতো খেতে হবে—দিব্যেন্দু জিজ্ঞেস করে।

—হ্যাঁ খেতে হবে, কচি ছেলে তো নন, সত্যি আপনাকে শাসন করা দরকার—অণিমা খাবারটা মন মত করতে করতে হেসে বললে।

বেশ আমেজী আত্মীয়তার সুর ওদের কথাবার্তায় জমে উঠেছে।

—শাসন ! তারতো একটা যুগ থাকে, আমি তাও পার হয়ে এসেছি।

—তা'হলে গাধার মত মানুষের পিছুপিছু ছুটছেন কেন বলুন তো? আশা নেই, বাঁচার ইচ্ছে নেই অথচ মানুষকে ক্ষেপাচ্ছেন—বাঁচার জন্যে লড়াই করো, এক হও—কি যে ব্যাপার আপনার ঠিক বুঝতে পারি না!

—ছোটার ক্ষমতা আছে ছুটছি, যেখানে পারছি না সেখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে—ঠিক বোঝাতে পারবো না আপনাকে আমি। মোট কথা, দুটোই আমার কাছে সত্য।

—বুঝলাম। যাক্ একটা অনুরোধ, নিজের দিকটা একটু দেখুন—কথা শেষে অণিমা কাঁটা দিয়ে মাংস তুললো মুখে।

দিব্যেন্দু কিছু বললে না, ও খাচ্ছিলো। বেশ ক্ষিদে পেয়েছিলো। ভ লই লাগছে রোস্টটা। বেশ সুস্বাদু। অনেকদিন মাংসের আস্বাদ পায়নি দিব্যেন্দু।

—কত ছো মানুষ আপনি! জীবন-সংগ্রাম করলেন না, সংসার প্রতিপ ন করলেন না, তবু আশা-ভঙ্গের সুর কেন আপনার আমার তো অবস্থায় পড়লে আপনি আত্মহত্যা করতেন। স্বদেশী শিখিয়ে লন—গরম কথা শুনে শুনে জীবনকেই কেয়ার করিনি। তখন ভাবতাম, এইভাবে চেঁচামেচি করে কেটে যাবে বোধহয়। ত র দুর্দিন যখন এলো তখন তো কুটোর মত ভেসে যাচ্ছি—একটু চুপ করলো অণিমা, শেষ রুটির টুকরোটা জুস য়ে মুখে পুরলো ও।

—বলুন, বলছিলেন আপনার কথা—দিব্যেন্দু আগ্রহ নিয়ে বললে াওয়া শেষ করে।

—ঠুনকে টা চাকরী। বৃদ্ধ বাবা মা, ছোটভাই, ছোট একটি বোন; র আর আমার রোজগারেও কুলোতো না—

একবেলা খেয়েছি দিব্যেন্দু বাবু আমরা! তারপর আরো জ্বালা, বিরক্তি আর হতাশায় মা বাবাকে অশ্রদ্ধাও করেছি; জ্বলেছিও সে জন্যে। ছোট ভাইবোনদের লেখাপড়া ছাড়িয়ে দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতেও দ্বিধা আসেনি। আপনার সঙ্গে এমনি এক সময়ে দেখা হয়েছিলো—একটু চুপ করলো অণিমা বয় আসতেই।

—দু' পেয়ালা চা, অণিমা বললে।

খাওয়া ওদের হয়ে গিয়েছিলো। বয় প্লেটগুলো নিয়ে চলে গেলে অণিমা বললে, আজকের বাঙ্গালী নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের ভেতরটা দেখেছেন কি কোথাও ঢুকে? আমারতো বিশ্বাস হয় না আপনি দেখেছেন, আমাদের জীবনের আজকের এই জঘন্য কুৎসিৎ বাস্তব রূপকে।

—সত্যিই দেখিনি অণিমা দেবী। ষ্টেশনে, রিলিফ ক্যাম্পে ওপর ওপর বাস্তুহারাদের দুঃখকষ্ট যতটুকু দেখেছি তাই সহ্য করতে পারি না। মনে হয় এখুনি ছুটে গিয়ে ভাগবাটোয়ারা করে যারা গদিতে বসেছে তাদের টুঁটি চেপে ধরি; উত্তেজিত কণ্ঠস্বর দিব্যেন্দুর।

—যাক্ যা বলছিলাম, ভেতরে ঢুকলে দেখতে পেতেন, মধুর সম্পর্কের সব যেতে বসেছে, ক্ষিদের জন্যে সভ্যতা বলুন, রুচি বলুন, সব যেতে বসেছে। আমারো এমনি অবস্থা হয়েছিলো সেদিন—বাবা হঠাৎ মারা গেলেন, চিকিৎসাই করাতে পারলাম না। দাদা স্বার্থপরের মত ঠিক এই সময়েই সরে পড়লো; প্রেম করে বিয়ে করে অন্য জায়গায় ঘর বাঁধলো। যারা যাচ্ছে যাক্, সে কেন যাবে! এমনি অবস্থার

মধ্যেও আমি সংসার ঠেলে নিয়ে গেছি। স্বার্থপরতা একবারে যে করিনি তা নয়—বাইরে মাঝে মাঝে লোভের তাড়নায় ভালো মন্দ কিছু খেয়েছি, সিনেমাও দেখেছি। কিন্তু একেবারে ছাড়তে পারিনি নিকট আত্মীয়জনদের, বোধহয় আপনাদের শিক্ষাই ছাড়তে দেয়নি। সে যাক্, এমনি দিনে এক সহৃদয় ভদ্রলোক, ধনী অবশ্য; আমাকে এই নীচতা থেকে উঠে আসতে সাহায্য করেন। এটা একটা একসিডেন্ট, সত্যিই একসিডেন্ট।

—ব্যাপারটা কি বলুন তো ?

—ষ্টেনো-টাইপিষ্ট আমি। কিন্তু কি জানেন, রূপের জৌলুস ছিল না, চেহারাটাও ভাল ছিল না, দেখেছিলেন তো আগে। বুঝিতো, আজকের দিনে মেয়েদের রূপ আর ভরাট দেহই বাঁচার সব চেয়ে বড় ক্যাপিটেল। একটু চেষ্টা করলেই ভদ্র ঠাট বজায় রেখেই বাঁচা যায়। বেশীর ভাগ মধ্যবিত্ত মেয়ে তো এই করেই দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু আমার তো সে উপায় ছিল না। নাক সিটকোতো সবাই। একদিন এক অফিসে ইনটারভিউ দিতে গিয়ে এক মহৎ-প্রাণ বৃদ্ধ সাহেবের দেখা পেলাম। তিনি আমাকে কি চো'খে দেখেছিলেন জানি না, প্রাইভেট সেক্রেটারীর চাকরীটা দিলেন, সাড়ে তিনশো টাকা মাইনে, থাকার জন্যে বিনি পয়সায় একটা ফ্ল্যাটও পেলাম থিয়েটার রোডের একটা বাড়ীতে—এই বলে চুপ করলো অণিমা।

বয় চা দিয়ে গেল। অণিমা চা'টা ঠিক করে নিয়ে এক চুমুক খেয়ে বললে, এখন বলুন তো, কি দরকার ছিল এইভাবে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার ?—হাসলো একটু অণিমা।

দিব্যেন্দু কথা বললে না। ও শুধু অবাক হয়ে চেয়ে থাকলো অণিমার দিকে—ভাবতে আশ্চর্য্য লাগছিলো; সেদিনের হাড় জিরজিরে আধমরা অণিমা বোস কি করে এত জীবনীশক্তি পেলো।

—আজ মনে হয় বাঁচাটাই সার্থকতা। আজ আমার মন সব মানুষের ভাল করতে চায়। এখন মনে হয়, কিছু করি আপনাদের সঙ্গে। এবার কিছু কাজের ভার দিতে পারেন, আমার সময়, সাধ্য মত করবো—কথা শেষে অণিমা বোস চাইলো দিব্যেন্দুর দিকে।

দিব্যেন্দু হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো—বড় আনন্দ হলো আজ! সত্যি বলতে কি, আপনাকে দেখে আপনার কথা শুনে, আমার মনে আশা জাগছে! মানুষ হয়তো সব নোংরামি কাটিয়ে সুস্থ অবস্থায় ফিরতে পারবে!

—এ বিশ্বাস কি ভেঙে গিয়েছিলো আপনার?

—গিয়েছিলো বই কি। লোককে বোঝালে বোঝে না, বলে এক করে এক, বিশ্বাস নেই, স্নেহ নেই, ভালবাসা নেই, শুধু টাকার বিনিময়ে একটা যান্ত্রিক সম্বন্ধের মধ্যে মানুষ নিজেকে আটকা রেখেছে।

—কিন্তু এটাতো জানেন, কত আঘাত এসেছে এই দেশের মানুষের জীবনে। মাত্র কটা বছরেই কি ঘটে গেল—যুদ্ধের শেষে লোভ-নোংরামি-দুর্ভিক্ষ-রায়ট্ মানুষের সব কিছুই ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। সেগুলো সারতে তো দেরীই হবে। হতাশ হলে চলবে কেন। কথা শেষে অণিমা হাসলো প্রশান্ত হাসি—একটি সুস্থ, সুন্দর দরদী নারীর মতই ওকে দেখাচ্ছে।

ভাল লাগলো দিব্যেন্দুর অণিমার এই সুস্থ কথাবার্তা।

—যাক্ অনেক কথা বললাম, বিশেষ করে অনেক গোপন কথা, যা মেয়েরা বলে না সাধারণতঃ। কিন্তু কি জানেন, আমার বন্ধু তো নেই। মন খুলতে পারিনে তাই। আপনাকে কেন জানি না, প্রথম থেকেই একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেই মনে হয়েছে; তাইতো এত কথা বলে ফেললাম—হাসলো অণিমা।

দিব্যেন্দু হেসে বললে, বন্ধু যখন তখন বলবেনই তো।

—আসুন না মাঝে মাঝে আমার বাড়ীতে সন্ধ্যের দিকে? সময়টা কাটবে ভালো।

—বেশতো যাবো।

—আপনিতো কথাই দেবেন, যাবেন না। চিনি না আপনাকে!

—বেশতো এবার দেখবেন কথার ঠিক থাকে কি না।

—বেশ, আচ্ছা বলুন তো আমার ঠিকানাটা কি?

দিব্যেন্দু একটু ভেবে হেসে বললে, থিয়েটার রোড, নম্বরটা তো মনে পড়ছে না। কত বললেন যেন?

—নম্বরতো বলিইনি, দেখলেনতো হাতে-নাতে! যাক্ এই কার্ডটা রেখে দিন, যদি মনে পড়ে যাবেন, কেমন—হেসে বললে অণিমা।

—সত্যি দেখবেন যাবো এবার, লজ্জাজড়িত স্বরে বললে দিব্যেন্দু।

—আচ্ছা দেখা যাবে, নিন চলুন, অনেকক্ষণ পর্দ্দার আড়ালে কাটলো।

—হ্যাঁ চলুন, উঠে দাঁড়ালো দিব্যেন্দু।

বাইরে বাস ষ্টপেজে এসে অণিমা বললে, বেশ কাটলো সময়টা আপনার সঙ্গে। আমারই লাভ—হাসলো একটু অণিমা

—আমারো কি কম লাভ হলো। বিশেষ করে খাওয়াটা, হাসলো দিব্যেন্দু।

—এ কথাটা আপনাকে মানায় না, যদি খাওয়া-দাওয়াটা নিয়মিত করতেন তো মানতে পারতাম, বললেতো আপনি করবেন না।

দিব্যেন্দু হাসলো শুধু বোকার মত, কিছু বললে না।

বাস এলো।

—চলুন, উঠবেন তো বাসে ?—অণিমা দিব্যেন্দুর দিকে চেয়ে বললে।

দিব্যেন্দু ইতঃস্তত করে বললে, হেঁটেই যাবো, ভাল লাগে হেঁটে যেতে।

অণিমা ওর দিকে ফিরে চোখ পাকিয়ে বললে, হুঁ, বলতে লজ্জা হচ্ছে, পয়সা নেই।

—না না সে'জন্যে নয়, গেলেতো বলতামই আপনাকে পয়সাটা দিয়ে দিন, হাসার চেষ্টা করে বললে দিব্যেন্দু।

—বেশ, চলুন আমিও হেঁটে যাবো আপনার সঙ্গে।

—সে কি! আচ্ছা তা'হলে বাসেই উঠুন।

অণিমা দিব্যেন্দুর দিকে একবার চেয়ে হেসে বললো, তাই উঠুন।

অণিমা থিয়েটার রোডে নেমে গেল ওর বাড়ীতে যাবার কথাটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে। দিব্যেন্দু হাসিমুখে

ঘাড় তুলিয়ে আর একবার প্রতিশ্রুতি দিলো। অণিমা নেমে গেলে দিব্যেন্দু নিজেকে এলিয়ে দিলে চিন্তার রাজ্যে ধারের সীটের কোণটায় বসে।—যাক্ অণিমা বোস তা'হলে জীবনটা একটা ছাঁচে নিয়ে এসেছে। আচ্ছা, এই কি জীবনের লক্ষ্য—ভাল ভাবে খেয়ে-পরে দিন কাটানো ? মন কি ক্লান্ত হয় না, বিরূপ হয় না একঘেয়ে দিনের পর দিন রাতের পর রাত নিয়মমাফিক এই স্থূল সুখের জীবনে ? হয়তো হয়। হয়তো অণিমাও সময় সময় অস্থির হয়ে ওঠে—কি পেলাম, এই কি জীবন !—না, বড় বাজে কথা ভাবছি—বিড় বিড় করে বলে উঠে দিব্যেন্দু সোজা হয়ে বসলো।

—জগুবাবুর বাজার—কণ্ডাকটর হাঁক দেয়।

দিব্যেন্দু চমকে ওঠে—নবানীদের বাড়ীর রাস্তাটা। কেমন আছে নবানী ? কে জানে ! হয়ত ভালই আছে। কই আর তো চিঠি দেয় না। একখানা চিঠিও তো আর দিলে না—শুধু একখানা চিঠির উত্তর না পেয়েই কি শেষ করে দিলো সব ! হয়ত ভাবেও না তাকে—নিজের মনেই হাসে দিব্যেন্দু। অথচ নবানীই একদিন বলেছিলো ঃ মনে পড়লো দিব্যেন্দুর—সন্ধ্যের অন্ধকারে মেমোরিয়ালের মাঠে বসে নবানী হঠাৎ বলেছিলো অসীম আকাশের দিকে চেয়ে—যাই হোক না আমাদের মধ্যে, বিরূপ হবো না কেউ কারো প্রতি, কেমন তাই না দিবুদা ?

—হয়ত হবো না।

—তুমি সোজা করে কথা দেখছি কোনদিনও বলতে পারবে না—ভিজে মাঠে নবানীর ভিজে ভিজে কথা ভারী মিষ্টি ছিলো সেদিন—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে দিব্যেন্দু একটা।

বাসটা হাজরা পার্ক ছাড়িয়ে এসেছে; বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলে দিব্যেন্দু।—জগুবাবুর বাজার ছেড়ে গেছে, যাক্ না স্বার্থপরের মত সরে, সবাই যায়। নবানী, আজকের অণিমা একই। যতই সুস্থতা থাক অণিমা বোসের, স্বার্থ একটু বেচাল হলেই ছিটকে যাবে। মানুষ দাস হয়ে গেছে স্বার্থের—ওরা ফিরবে না। কিন্তু এ সব ভাবছে কেন সে! বাজে সব, তার চেয়ে রাসবিহারীর মোড়ে নেমে অসিতের সঙ্গে একবার দেখা করে গেলে ভাল হয়—দিব্যেন্দু উঠে দাঁড়ালো। আর ভাবতে রাজী নয় দিব্যেন্দু। কাজই ভালো। ওদের চোখে অকাজ, তবু এ কাজ ওদের চেয়ে ভাল, অনেক ভাল।

কালীঘাটের যজ্ঞেশ্বর তলার গলিতে খানকয়েক বাড়ীর পর একটা পুরোণো একতলা বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেল অশোক।—চিত্রা একটু দূর থেকেই দেখলে। বেশ বড় করে মাথায় ঘোমটা টানা ছিল ওর। অশোক ভেতরে ঢুকলে ঘোমটা নামিয়ে দিলো চিত্রা। ঘৃণা হচ্ছিলো চিত্রার নিজের প্রতি—কি দরকার ছিল এমন করে লুকিয়ে ওকে অনুসরণ করার? গোয়েন্দাগিরির এ নীচ প্রবৃত্তি কেন এলো—হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে যায় চিত্রার। কাঁদতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তার কি দোষ। কেন এমনি অবস্থার সৃষ্টি করেছে অশোকদা? সোজাসুজি তাকে নিয়ে এলেই তো পারতো। ঠিকানা দেবে বলেছিলো তাও দেয় নি, তারপর আবার এলো অনুমতির প্রশ্ন—হেঁয়ালীর জালতো অশোকদাই বুনেছে।—না, দেখাই যাক না কে এই

নারী!—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এগিয়ে গেল ঐ বালি-খসা বাড়ীটার দিকে চিত্রা।

দরজা পার হতেই একজন কুৎসিত-দর্শন লাল কাপড় পরা শিষ্য ওর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, কি চাই আপনার এখানে?

কুৎসিত লোকটিকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে চিত্রা বললে, মার সঙ্গে একটু দেখা করবো।

—মার দর্শন তো এখন পাবেন না, তিনি এখন ঘণ্টা দেড়েক বাইরের কারো সঙ্গে দেখা করবেন না।

—কেন, পূজোয় বসেছেন নাকি?

—না, অত দরকার কি আপনার, এখন দেখা হবে না।

—কিন্তু, একটা কাতর অনুনয়ের ভাব ফুটে ওঠে চিত্রার মুখে চোখে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চলে যাচ্ছিলো ও।

—শুনুন,—লোকটি নরম হয়ে ডাকে চিত্রাকে।

চিত্রা ফিরে চাইলো লোকটির দিকে।

—কি দরকার আমাকে বলতে পারেন, বশীকরণ-টশিকরণের কিছু কি?—লোকটি চোখ টেনে বললে।

—না, আমি ওসব কিছুর জন্যে আসিনি।

—ওসবের ব্যবস্থাই এখানে করেন মা। দেখুন, আপনি ভদ্র ঘরের মেয়ে, জানেন না যখন কিছু এখানকার ব্যাপার তখন সরে পড়ুন, জায়গাটি সুবিধে নয়—হঠাৎ যেন সদয় হলো লোকটি।

—কেন অনেক ভাল লোকতো আসে এখানে মার কাছে!

লোকটা একগাল হেসে বললে, মোটেই ভাল নয় তারা; গাঁজা মদ আর জুয়ো, সবই চলে, ঐ যে দেখুন না এ পাশের

ঘরটার দিকে, ভদ্রলোকদের কারবার, মার ভক্তের দল কারণ-বারি পান করছেন!

চিত্রা শিউরে ওঠে—কি ভীষণ জায়গা ! তা'হলে অশোকও কি এই সব—না না কি ভাবছি যা তা।

—আচ্ছা বলতে পারেন, অশোকবাবু বলে এখানে এক ভদ্রলোক আসেন তিনি কি করেন ?

—অশোকবাবু! আপনার কেউ হয় নাকি ?

—হ্যাঁ আমার আত্মীয়।

—তাই বলুন, অশোকবাবুর আত্মীয় আপনি! তাঁর জন্যেই তো মা দেড় ঘণ্টা আটকা থাকেন। কি চোখেই যে দেখেছে ওকে ; অশোক অশোক করেই গেল।

—দেড় ঘণ্টা পূজো করেন বুঝি অশোকবাবু ?

—পূজো!—চোখটা একবার উলটিয়ে লোকটি হাসলো একটু, তারপর বললে, পূজোই বটে! মা-ছেলের সম্পর্ক পাতিয়েছেন তাই আমাদের মা দেড় ঘণ্টা ধরে একটু আদরের লীলা করেন মা ছেলে মিলে! দেখুন, অশোকবাবু গোল্লায় গেছেন!

—কি বলছেন আপনি!—কেঁপে ওঠে চিত্রার সারা শরীরটা।

—ঠিকই বলছি, আর মাও ছাড়ছেন না, নেশা দুজনেরই ধরেছে।

—বাজে কি সব বকছেন আপনি!

—নেশা করিনি মা জননী, বিশ্বাস না হয়, চলে আসুন পগারের ধারে। জানালার ফাঁক দিয়ে নিজে চোখে দেখেই যান।

চিত্রা কাঁপছে। গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে। কথা বেরুচ্ছে না। অস্পষ্ট স্বরেই বললে, চলুন।

—আসুন—সামনের দরজা দিয়ে রাস্তায় এলো লোকটি, পিছনে চিত্রা। তারপর রাস্তাটার শেষে খুব সরু ময়লা-ভরা কানা গলিটার দিকে লোকটা এগিয়ে গেল।

—এই যে আসুন, দেখে যান!—চাপা গলায় বললে লোকটা।

চিত্রা কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এলো। ওর বুকের ভেতরে জোরে জোরে কে যেন ঘা মারছে।

—দেখুন কি লীলা চলছে—থুতুতে-লালাতে-হাসিতে মিশিয়ে অদ্ভুত করে বললে লোকটা।

চিত্রা মুখটা বাড়ালো পাশ থেকে—কিন্তু একি!—চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না যে!—অশোক শুয়ে রয়েছে একটি সুন্দরী পূর্ণ যুবতীর কোলে। অদ্ভুত সুন্দরী। সোনার মত রং। পরণে গৈরিক। নারীটির এলো চুলে, টানা চোখে, পাতলা ঠোঁটে অজস্র কামনা—চিত্রা দেখলো। জ্বলে উঠলো শরীর ওর—এই মাতৃরূপ দর্শন! ছিঃ ছিঃ, অপদার্থ, নীচ, কামুক। ভড়ং করে পূজো করা—অশোকের দিকে চেয়ে দেখলো চিত্রা—আমেজে অশোক বেহুঁস।—লজ্জা করে না ইতরামী করতে ওর?

—খাও না অশোক। আমার যে ইচ্ছে করছে—অশোকের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো নারীটি,—দেখলো চিত্রা। গলার স্বরটা কিন্তু অদ্ভুত। যাদুর মত মিষ্টি।

—খাবো তুমি বলছো মা, কিন্তু—

নারীটি অশোকের গালে চুমু খেয়ে হেসে বললে, লজ্জাকে জয় করতে হবে না—এই বলে বুকের কাপড়টা সরিয়ে দিলো।—

শুভ্র নিটোল আধ-ফোটা দু'টি পদ্ম—কামনা ঘন করে। স্নেহ-নির্য্যাস বারির আধার নয় যেন।

কিন্তু একি!—বিস্ময়, ঘৃণা আর জ্বালায় মিশে কি রকম যেন হয়ে—অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখতেই থাকে চিত্রা।

অশোক আস্তে আস্তে তার হাত দুটো দিয়ে নারীটিকে জড়ালো, তারপর মুখটা এগিয়ে নিয়ে গেল।

—এই তো লক্ষ্মী ছেলে, মণি আমার।

না না, আর না। আর দেখতে পারছে না সে এই জঘন্য নির্লজ্জ কামনার সুচারু বিকৃতি—সরে এলো চিত্রা জানালার ধার থেকে কাঁপতে কাঁপতে। পৃথিবী যেন নেমে যাচ্ছে নীচে। দাঁড়াতে পারছে না চিত্রা। নোংরা গলিটা ছেড়ে কোনমতে বেরিয়ে এলো ও।

লোকটি কিন্তু জানালার পাশেই দাঁড়িয়ে দেখে আর মুচকে মুচকে হাসে। হয়তো বিকৃত রসে মশগুল হয়ে গেছে। এলো না।

চিত্রাও পিছন ফিরলো না আর। এগিয়ে গেল সামনের দিকে শরীরটাকে কোনমতে ব'য়ে নিয়ে।

আর এদিকে চেতন-অবচেতনের সীমা পারে দাঁড়িয়ে অশোকের মাতৃ-রসাসিক্ত মন কোথায় কোন জ্যোতিষ্কের উদ্দেশ্যে ভেসে চলেছে। কিন্তু মাতৃরূপের প্রতীক ঐ সুন্দরী নব-যৌবনা নারী হাসছে মনে মনে আর আসক্তির কারণে সিক্ত করে চলেছে নিজের দেহকে অশোকের কোমল স্পর্শ দিয়ে নিজের খুসী মত।

অশোক বিভোর হয়ে লেহন করছে ঐ নারীর সুগঠিত স্তন—কামনার থক থকে আধার। কে জানে অশোক পূণ্য-পীযুষের আস্বাদ পাচ্ছে কি না। হয়ত পাচ্ছে। ছোট ছেলের মতই মাকে আকর্ষণ করছে অশোক। আর মা ছেলেকে রক্ত-মাংসের সজীব কামিনীর মতই পাঁক দিয়ে জড়াচ্ছে।—সামনের ঘন অন্ধকারের মধ্যে মিশে যাবে মাতৃরূপ এক হয়ে হয়ত। খুঁজে পাবে না অশোক তার সত্যদ্রষ্টা মাকে। বহুরূপী নারীর অসীম কামনার অন্ধকার অশোকের এতদিনের অর্জিত জ্ঞানের সমাধি রচনা করবে। সভ্য মানুষের বিকৃতির চরম উৎকর্ষের রসদই জোগাবে অশোক। জলে লেখা নামের মতই মুছে যাবে চিত্রার পরমারাধ্য মানসসঙ্গী অশোক হয়ত।

❁

এ কি হলো, কি পাপের শাস্তি দিলে ভগবান—বাসন্তী ভেঙে পড়েছেন। উঠতে পারছেন না। ঘরের আলো জ্বলেনি। জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে সব বাসন্তীর।

এ কি করলে ঠাকুর—ছটফট করেন বিছানায় একা একা বাসন্তী। তিরিশ বছর আগের মতই বিপদের দিনে ঠাকুরকে স্মরণ করছেন বাসন্তী। নীড় ভেঙ্গে যাচ্ছে। বিশৃঙ্খল সংসারে আর জোড়াতালি দেওয়ার উপায় নেই। ছিদ্রের পর ছিদ্র বেড়েই চলেছে। একটাকে চাপা দেন তো আর একটা বেরিয়ে পড়ে। একেতো আজ দুদিন বিচিত্রার কোন খোঁজ নেই বাড়ী ফেরেনি বিচিত্রা দু'দিন। কোথায় গেল মেয়েটা কে জানে। পেটের মেয়ে তো, হোক না মুখরা নীচ; তবু মেয়ে তো।

বাসন্তীর উপায় নেই খোঁজ করার। কোথায়, কার কাছে বলবেন বিচিত্রার হঠাৎ অন্তর্ধানের কথা—ছিছি করবে, থুথু ছুড়বে। পারিবারিক সম্মান যাবে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন তাই বারে বারে সারা দুপুর ধরে বাসন্তী।

বিকেলে মিঃ সোম এলেন আজ অনেকদিন বাদে।

বাসন্তীকে বললেন, চলুন মিসেস বাসু, বেড়িয়ে আসি কোথাও।

বাসন্তীর ভাল লাগছিলো না। বেড়াবার আমন্ত্রণ নিলেন। বেরুলেন তিনি সোমের গাড়ী করে।

—কোথায় কোন দিকে। কিন্তু তার আগে আমাদের রোজের নিয়ম রাখতে হবে, আগে তো ফেরাজেনী—চা কেক্, তারপর যেখানে খুসী, কি বলেন ?

বাসন্তী আজ বেশ অন্যমনস্ক। যা ওঁর স্বভাববিরুদ্ধ। বিচিত্রার কথা ভুলতে পারছেন না।—কি বলবেন তিনি রাসবিহারী যখন জিজ্ঞেস করবেন, মেয়েটা গেল কোথায় ? ভয়ে কুঁচকে গেছেন বাসন্তী। মিঃ সোমের কথার ভাল মন্দ কি কিছুই কাণে আসছে না। তাই সবেতেই সম্মতিসূচক ধ্বনি। মিঃ সোম এতেই খুসী।

গাড়ী চৌরঙ্গীর দিকে এগিয়ে চলে।

চৌরঙ্গীতে বিকেলের বাসন্তী-রঙা রোদ আয়েশের নেশা ধরায়। চা-ঘরে, কফিখানায় আর বারেতে ভীড় জমে—মিষ্টি-ঝাল-কটুকষা-তেঁতোর আস্বাদের পর মউজী সঙ্গীর সঙ্গে মৌতাতের সময় এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে।

এমনি সময়েই ফেরাজেনীতে এলেন বাসন্তী। আগের মতই কোণের দিকের একটা টেবিলকে ঘিরে বসলেন বাসন্তী মিঃ সোমের মুখোমুখি। আজ স্মার্ট হওয়ার প্রচেষ্টা নেই বাসন্তীর। সহজ সোজা আজ অনেক। সম্পূর্ণ আলগা করেই দিলেন নিজেকে। দৃষ্টি আকর্ষণ করার রুচি নেই বাসন্তীর।

বয় চা কেকের অর্ডার নিয়ে গেল।

—সত্যি আপনি এত বেশী ভাবছেন যে নিজেকেও ভুলে যাচ্ছেন, মিসেস বোস—মিঃ সোম বললেন।

ম্লান হেসে বাসন্তী বললেন, ভাবছি! তা হয়ত ভাবছি। কিন্তু রেহাই নেই যে, আসছেই একটার পর একটা।

—কেন ভাবেন আপনি, কত বারইতো বলি আপনাকে আনন্দ করুন, সব উড়িয়ে দিন। আপনি কি শুনবেন সে কথা!

—শুনেও তো কাজে লাগলো না মিঃ সোম। হয়ত বাঁচার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

—কি বলছেন আপনি যা তা, কতই বা বয়েস আপনার! আমার থেকে অনেক ছোট আপনি, রাসবিহারী অবশ্য বছর পাঁচেক বড় হলেও হতে পারে। তা আপনি যে কি করে বলেন দিন ফুরিয়ে এসেছে—মিঃ সোম হাসলেন মুরুব্বিয়ানা হাসি। চিরাচরিত হাল্কা আলাপই জমাতে চেষ্টা করেন মিঃ সোম।

বাসন্তীর মন হাল্কা আলাপের বাইরে চলে গেছে অনেক আগেই। নিয়ম রক্ষা করতে এসেছেন শুধু আগের জের টেনে। আজ আর ধৈর্য্য ধরে শুনলেন না মিঃ সোমের কথা। রাস্তার দিকে চেয়ে শুধু বসে থাকলেন বাসন্তী।—কি বলবেন কেউ

জিজ্ঞেস করলে, বিচিত্রা কোথায় গেছে।—মেয়ের সঙ্গে যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ ইদানীং, একথা কেউ তো জানে না। ঝগড়া করেছেন, গাল দিয়েছেন, বাড়ী ছাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।—উঃ, একি হলো—চোখ বুজলেন বাসন্তী।

—কি হলো আবার?

—মাথা ধরেছে খুব, না বেরুলেই ভাল হতো—পাতলা হাসি হাসলেন বাসন্তী।

—চা-টা খেয়ে না হয় বাড়ীই ফিরে চলুন—মিঃ সোম একটু যেন ক্ষুণ্ণ হয়েই বললেন।

—তাই চলুন,—হাতে ভর দিয়ে মাথাটা রাখলেন বাসন্তী।

—হি-হি-হি, উচ্চ অশ্লীল একঝলক হাসি এসে আঘাত করলো ফেরাজেনীর দরজায়।

—বিউটি, বাট মাইণ্ড ইটস্ সিক্স নাউ—কাম অন জো, বি স্মার্ট—সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো নবাগতা।

বাসন্তী চমকালেন—বিচিত্রা, তাঁরই মেয়ে বিচিত্রা! যার জন্যে মন উৎকন্ঠিত। আর ঐ মেড়ো চেহারার লোকটার সঙ্গে—উঃ কি সাহস! আর কি কুৎসিৎ!—বিচিত্রার খসেপড়া শাড়ীর আঁচলটা—চোখ ঢাকলেন বাসন্তী। আর দেখতে চান না তিনি। অথচ একদিন এই সমাজে পাঠানোর জন্যেই তৈরী করছিলেন ঐ বিচিত্রাকে।

মিঃ সোম হতভম্ব হয়ে বসে থাকেন। কেমন অস্বাভাবিক জায়গায় এসে পড়েছেন মনে হচ্ছে তাঁর। অথচ ভাল লাগছিল এই ফেরাজেনী। আর ঐ বিচিত্রাকে মেয়ের মতই মনে হয়েছে তার। কিন্তু আজ যেন সম্পূর্ণ আলাদা। বিদেশিনীর মত লাগছে বিচিত্রাকে। একটু আগের ভাল-লাগা ফেরাজেনী অনেক দূরে সরে গেছে মিঃ সোমের কাছ থেকে।

—চলুন ;—এ পাশের দরজা দিয়ে,—ভাঙ্গা স্বর বাসন্তীর।

সন্ধ্যে উতরানোর আগেই বাসন্তীকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন মিঃ সোম। থমথমে আবহাওয়াটা তাঁর পছন্দ নয়। হাল্কা ধরণের লোক মিঃ সোম, হাল্কা আবহাওয়ায় থাকতে ভালবাসেন। তাই সরে গেলেন বাসন্তীর ছোঁয়াচ থেকে।

একা গুম হয়ে বাসন্তী বসে থাকলেন নীড়ের বাইরে বসার আচ্ছাদিত চাতালটায়।—কি হয়ে গেল সব, এত আশা, সম্মান, প্রতিপত্তি, জমক, কোথায় চলে গেছে। নিজেকে এতো নগ্ন কোনদিন মনে হয়নি বাসন্তীর—আজ কি নিয়ে বাঁচবেন তিনি! স্বামী, ছেলেমেয়ে সবইতো নাগালের বাইরে। তাদের ভাল-মন্দে তাঁর কি যোগ রইলো?—এযে অতিথশালার আশ্রিতার মত একমুঠো ভাতের প্রত্যাশায় দিন কাটানো—না, এ তো আমি চাইনি! আমার ছেলেমেয়েরা সমাজে মান্যগণ্য হয়ে থাকুক, শুধু তাইতো চেয়েছি। নোংরামির মধ্যে নিয়ে যেতে চাইনি—বিচিত্রার বিয়ে দিয়ে তাকে সুখী দেখতে চেয়েছিলুম!

চিত্রা, সুচিত্রার শিল্পী-মন সমাজে প্রতিষ্ঠা পাক্; তাই কি চাইনি? কিন্তু কেউ কি নিলে! সুচিটা আজকাল আবার ঐ কালপেঁচাটার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে—হয়ত বিচিত্রার মত নীচে নামবে! ভগবান—কি হবে ঠাকুর?—না না ওকে আমি নীচে নামতে দেবো না, সস্তা হতে দেবো না। কিন্তু আর শুনবে কি? দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন বাসন্তী চেয়ারে ঘাড়টা কাত করে দিয়ে। আর ভাবতে পারেন না। কিন্তু ভাবনা তো ছাড়ে না। আবার আসে। আবার মনকে তোলপাড় করে বিচিত্রা—কেউ যদি জিজ্ঞেস করে বিচিত্রার কথা; কি বলবো? নীচে তলিয়ে গেছে সে—এই কথা বলতে হবে? পারবো না, পারবো না আমি। কত কষ্টে পেটে ধরেছি, মানুষ করেছি—কি করে বলবো যে—মাথার ভেতর কি রকম যেন করে উঠলো বাসন্তীর। ভয় আশঙ্কা লজ্জা মমতা সব মিলে স্নায়ুগুলোকে অবশ করে দিলো। চেয়ায় ছাড়ার শক্তিটাও যেন আর পাচ্ছেন না।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসছে ললিত-কলা ভবনের পিছনের পুকুরটাকে ঘিরে। গাছ-পালা ঘেরা পুকুরটা শান্ত হয়ে গেছে সন্ধ্যার নরম স্পর্শে। সান্ধ্য-গায়ত্রীর মত শান্তির গভীরে এখনকার এই পরিবেশ—দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে শিবেন্দু দেখছিলো। চিত্র-প্রদর্শনীতে এসেছে শিবেন্দু। কিন্তু এই জীবন্ত ছবি ছেড়ে দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলোতে মনকে নিয়ে যেতে পারছে না ও।—ঐ পাখীগুলো নীড়ে ফিরছে সবুজ শ্যামল আর ধূসরে মিশে। আর ওদের ঘরে ফেরার ডাক—

ভালো, খুব ভালো লাগলো শিবেন্দুর ঐ ডাক। ক্লান্ত প্রাণকে শান্তি এসে অভয় দিচ্ছে—এস, আবার দেবো অফুরন্ত প্রাণশক্তি। শিবেন্দু প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিলো। মন যেন অনেক ছাড়তে পারে, অনেক নিতে পারে এখন ওর।

বিখ্যাত ফরাসী শিল্পীদের চিত্রের প্রদর্শনী।—ওদেশের শিল্পী-ছাত্ররা বিখ্যাত শিল্পীদের ছবির মক্সো করেছেন, তারই প্রদর্শনী। শিবেন্দু এসেছে তাই দেখতে ; সঙ্গে খগেন, শ্রীনিবাস, বিজয় আর নিখিলেশ। বিদগ্ধ চিন্তাশীল সমাজের অংশ ওরা। মতামত দেবে। শুনবে দেশের লোক।

ছিটকে ছিটকে ঘুরছিলো ওরা। নিজের নিজের রুচি মত দেখছে ছবি। নিজেদের ধ্যান-ধারণার মিলও খুঁজছে ;—বিশেষ করে বিজয়, শ্রীনিবাস। আবার নিখিলেশ আর খগেন ছবি দেখার চেয়ে রঙ্গীন দর্শকদের দর্শনীয় যা' তাই দেখছিলো।

শিবেন্দুর মত কেউ নিথর হয়ে দেখছিলো না এই বিশেষ একটি সন্ধ্যার ছবিকে। হয়ত কোন শিল্পীর তুলিতে ফুটবে না এ ছবি, তবু এ বেঁচে থাকবে শিবেন্দুর সঙ্গে। জীবনের সব চেয়ে মধুর চাওয়াটি এ ছবির সঙ্গে মেশা।

অন্ধকার ঘোর হলে শিবেন্দু আবার বারান্দা থেকে সরে এলো ফ্লোরেসেণ্ট ল্যাম্প-এর তীব্র আলোর তলায় দেওয়ালে পিন করা ছবির কাছে। খুঁতিয়ে খুঁতিয়ে দেখলো বাকী ছবিগুলোও।

—পিকাসোর এই ষ্টীল-লাইফ কেমন সুন্দর দেখুন, কেমন আবছা একটা জীবনের আভাস—শ্রীনিবাস শিবেন্দুর পাশে দাঁড়িয়ে বললে টেনে টেনে।

শিবেন্দু আবার ছবিখানা দেখলে—একটা মেণ্ডোলা টাঙানো রয়েছে, টিপয়ের মত একটা টেবিলে একটা মদের বোতল, একটা পাত্র আর কিছু আহার্য্য, এই মিলিয়ে মোটা রেখায় আবছা ছবি—তেমন সুন্দর লাগলো না শিবেন্দুর। তবু ও শুধু একবার তারিফের হাসি হাসলো, মনের স্পর্শ ছাড়াই। তারপর এগিয়ে গেল অন্য ছবির দিকে।

অভিজাত অনেকই এসেছেন। বিশেষ করে মেয়েরা—নানা বেশে নানা ঢঙে ঘুরছে ওরা পুরুষের পাশে পাশে, কাছে কাছে! তারিফের ব্যাভিচারের অন্ত নেই। আর্ট-ক্রিটিকের মত নানা মন্তব্য কানেও আসে শিবেন্দুর।

—আই লাইক গঁগা মাচ মোর দ্যান ভ্যান গক্‌, হাউ ডু ইউ লাইক ইট—দিস 'তাহিতি গার্ল্স'? মেয়েটির তীক্ষ্ণস্বর কানে এসে লাগলো শিবেন্দুর। চাইলো ও মেয়েটির দিকে—কি বিশ্রি বেশ, কোমর থেকে অনেকখানি খোলা একটা পাতলা জামা গায়ে দিয়েছে। বুক থেকে পাতলা শাড়ীর আঁচল খসে পড়ছে বারে বারে, মুখশ্রীও যমালয়ে গেছে। মুখখানা একটা প্রসাধনের টেবিল বললে চলে—মুখ ঘুরিয়ে নিলো শিবেন্দু।

—সুপার্ব, বিউটি—চাটুকার বল্‌ল মেয়েটিকে খুসী করতে।

—হ্যালো বিচিত্রা, হাউ লং? আরে মিঃ আগরওয়ালা যে।

—আরে মিস মিটার, নমোস্কার।

—নমোস্কার, শিখেচো তাহলে?

—তুমি কতক্ষণ রীতা?

—বেশী নয়, ফিফটিন মিনিটস্‌ মোর অর লেস—বললে রীতা মিত্তির—ক্যাসানোভা আর পিন্সেসের-বিখ্যাত রীতা মিত্তির।

—চল ওদিকটায় ছবি দেখি—বিচিত্রা বোধহয় শিবেন্দুকে দেখে ফেলেছে। শিবেন্দু বিচিত্রাকে দেখেই ওখান থেকে সরে গিয়েছে। মনটা ওর খারাপ হয়ে গেছে—একি দেখলো সে! তার বোন একটা লোচ্চা লোকের অন্তরঙ্গ! আর ঐ লোকটার সঙ্গে কেমন করে এলো বিচিত্রা! ঐভাবে নির্লজ্জ হওয়াটাই কি ফ্যাশন্, হাতে হাত জড়িয়ে, মুখচোখে বেমানান হাসি—বড় চোখে লাগছে! মেশে মিশুক কিন্তু অশোভন হবে কেন! শিবেন্দুর মনটা আক্ষেপ করে।

—কি ব্যাপার দেখছি হে—খগেন শিবেন্দুর কাছে এগিয়ে এসে আস্তে করে বললে।

শিবেন্দু চাইলো খগেনের দিকে।

—তোর বোন বিচিত্রা নয় ওই মেয়েটি।

—হ্যাঁ, তাইতো মনে হচ্ছে,—শিবেন্দু গম্ভীর স্বরে বললে।

—হুঁ; সঙ্গের ও লোকটার সঙ্গে কি করে আলাপ হলো ওর—জিজ্ঞেসা করে খগেন।

—আমি তো ওর পি, এ, নই! চ' এখান থেকে আর ভাল লাগছে না—বিরক্ত হয়ে উঠে বললে শিবেন্দু!

—তা চল। কোথায় যাবে এখান থেকে?

—মাঠে গিয়ে বসবো কিছুক্ষণ,—শিবেন্দু অন্যমনস্ক হয়ে বলে।

—ঠাণ্ডা যে। তার চেয়ে চ'না গলাগুলো ভিজিয়ে মেজাজ ঠাণ্ডা করি,—হাসলো খগেন!

—আগে বেরোও তো এখান থেকে।—খগেন কোন কথা না বলে সামনে কাকে যেন লক্ষ্য করে। তারপর সেদিকে

চেয়ে থেকেই শিবেন্দুকে বললে,—দেখতো লোকটা কে, বিকাশ না?

শিবেন্দু দেখলে, তারপর ঘাড় নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ বিকাশই।

—সঙ্গের মেয়েটি আবার কে, ফিয়াঁসে নাকি, কেউ বাদ যান না দেখছি—মন্তব্য করলে খগেন।

শিবেন্দু ভাল করে দেখলে এবার মেয়েটিকে। ভারী সুন্দর তো; পটে আঁকা প্রতিমার মত। কিন্তু মুখটা চেনা চেনা লাগে যে।

—দাঁড়া খোঁজ নিচ্ছি,—এগিয়ে গেল খগেন। নিখিলেশও এগিয়ে গেছে। শিবেন্দু ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের আলাপের খুঁটিনাটি লক্ষ্য করে সে। হাসি হাসি কথাবার্ত্তা, অনেকদিন বাদে বন্ধুত্ব জানানো চলেছে। মেয়েটি হাসছে নম্র হাসি—বা বেশ সুন্দর তো। এখানে এতগুলো মেয়েদের মত ও নোংরা নয়। জাহির করার হীন প্রচেষ্টা নেই, মার্জ্জিত রুচি আর সুস্থ মনের সুষমা আছে মেয়েটির মুখেচোখে—ভাল লাগে শিবেন্দুর।

খগেন ওদের নিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে যে।

—শুনেছো হে, ভেতরে ভেতরে বিয়েটি করে ফেলেছেন আমাদের বিকাশচন্দর।

—তাই নাকি! তারপর কেমন আছেন, কেমন লাগছে—শিবেন্দু মৃদু স্বাগতের হাসি হাসলো।

—ভালো লাগারই কথা তো; কিন্তু এখনও অনেক বাধা। —লাজুক-হাসি হেসে বললে বিকাশ।

—সে কি—খগেন আশ্চর্য্য হলো।

—হ্যাঁ ভাই, এখনও পাকাপাকিভাবে—মানে সামাজিক অনুষ্ঠানটা না হলে ঠিক—একরাশ লজ্জা এসে বিকাশকে থামিয়ে দিলো। পাশের মেয়েটি বসন্তের গাছভরা কৃষ্ণচূড়ার মত রাঙা হয়ে উঠলো যেন। সেইজন্যে নীচুও হলো ওর চিবুকটি—শিবেন্দুর ভালো লাগে।

—তা'হলে বিয়ে হয়েছে বললে যে—নিখিলেশ জিজ্ঞেস করে।

—হয়েছে আইনে, কিন্তু ইনি সামাজিক অনুষ্ঠানটা চান—হাসির ঝিলিক ঠোঁটে লেগে থাকে বিকাশের।

—তা' হলে রীতিমত লভ্—খগেন হাসলো স্থূল-হাসি।

—তা অনুষ্ঠানের দেরী কেন, লাগিয়ে দাও। আমরা মিষ্টান্ন বিতরণের মধ্যে নিজেদের তুষ্ট করি—বিজয় বললে।

--একটু দেরী হবে ভাই, এঁর বাড়ীর সঙ্গে বোঝাপড়াটা শেষ না হলে তো হয়ে উঠছে না।

নিখিলেশ মেয়েটিকে এবার সরাসরি প্রশ্ন করলো,—আপনার বাড়ীর লোক বাধা দিচ্ছেন নাকি?

মেয়েটি সকলের দিকে একবার চেয়ে দেখলো, তারপর মুখে হাসির রেখা টেনে বললে,—বাধা ঠিক নয়; তবে সংস্কারকে ঠিক ছাড়তে পাচ্ছেন না, তাই একটু সময় নিয়েছেন আর কি।

শিবেন্দু কথা বলছিলো না। ও শুধু বিকাশকে আর মেয়েটিকে দেখছিলো। সেই সাহিত্যিক আড্ডার মুখচোরা

বিকাশ! কথা কম বলতো, লিখতো কিন্তু ভালো। এক কোণে এসে বসতো। বয়সে ছোট বলে একটু এড়িয়ে চলতো বিকাশ—মনে পড়ে গেল শিবেন্দুর।

—আপনি কেমন আছেন?—বিকাশ জিজ্ঞেস করলে শিবেন্দুকে।

—আমি? খারাপ আর কোথায়, ভালোই তো—হাসলো শিবেন্দু বিকাশের দিকে চেয়ে।

ঠিক এই সময় মেয়েটি চমকালো যেন শিবেন্দুর দিকে চেয়ে।—ঠিক সেই রকম হাসি, মুখের আদোল যেন তেমনি! হাঁ, দিব্যেন্দুর দাদা শিবুদাই—ঐতো চিবুকে সেই ছোট্ট কাটা দাগ না? ছোটবেলায় একবার তাকে আর দিবুদাকে তাড়া করতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল শিবুদা—হঠাৎ মনে পড়লো নবানীর। চিনতে পারেনি বোধহয় তাকে. না-চেনেন যেন—মনে মনে কামনা করে নবানী, মনটাও কেমন যেন খারাপ লাগে ওর। আবার পুরোণো কথায় ফিরে যেতে চাচ্ছে মন। নবানী ভয় পায়।—আবার কেন পুরোণো দিন; বেশ তো চলেছে সে বিকাশের সঙ্গে।

—আচ্ছা আজ যাওয়া যাক্। খবর দিচ্ছি, আসা চাই কিন্তু সকলের—এদের সঙ্গ ত্যাগ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বিকাশ। ওর মন আড়ষ্ট ধরাবাঁধা কায়দায় চলতে চাচ্ছে না।

—আচ্ছা—শিবেন্দু হেসে হাত জোড় করে বিদায়-সম্ভাষণ জানালো। যাবার আগে নবানী শিবেন্দুর দিকে চাইতে পারলো না। আগেই ঘুরে দাঁড়িয়েছিলো। এখান থেকে যেতে পারলে সে বাঁচে যেন। অপরিচিতার পর্য্যায়ে থাকতে পারলেই কোন গোল নেই। নবানী আগেই এগিয়ে গেল।

—তা' হলে খবরটা ঠিক মত যেন পাই—নিখিলেশ আর একবার স্মরণ করালো।

—নিশ্চয় পাবে। আচ্ছা চলি।—বিকাশ আর দাঁড়ালো না, নবানীও দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে!

—আমরা আর দাঁড় কেন, চল সব—খগেন এগুলো শিবেন্দুর কাঁধে হাত রেখে। পিছনে আর সকলেও বেরিয়ে এলো।

বাইরের রাস্তাটা বেশ নির্জন। দু'একজন পথচারী আর মাঝে মাঝে দু'একটা মোটর চলেছে। শিবেন্দুর ভাল লাগলো রাস্তাটা। ঠিক তার মনের মতই—ওর মনও এমনি নির্জন। মাঝে মাঝে দু'একটা ঘটনা একটু যা চঞ্চল করে দিয়ে যায়। বিশেষ করে আজকে বিচিত্রাকে দেখার পর থেকে মনটা ঠিক বাঁধতে পারছে না সে। কি করছে মেয়েটা! বাড়ীতে তো দেখাই হয় না—কি রকম বেপরোয়া হয়ে গেছে বিচিত্রা। আর ওই মেয়েটি, অমনটা হতে কি বাধা ছিল ওর!

—শিবু তোকে যে একটা কথা বলবো ভাবছিলাম—খগেন বললে।

—কি বল?

—তোর বোনটাকে একটু দেখিস, মানে ঐ মেড়ো লোকটাকে আমি চিনি, একটা ফাস্ট কেলাশ ডিবচ, বাঙ্গালী মেয়েদের উপর অসম্ভব লোভ লোকটার।

শিবেন্দু কোন কথা বললে না; ও শুধু শুনলো চুপ করে খগেনের কথাগুলো।—এতখানি নীচে নেমে গেছে তার বোন!

পয়সাওলা কামুক মেড়োর হীনপ্রবৃত্তি চরিতার্থের আধার বিচিত্রা—চোখ বুজলো শিবেন্দু। এ কথা ভাবতেও ঘৃণা হয়। কিন্তু কেন এমনি হলো ? জানা নেই তো! কতটুকু দেখেছে সে বিচিত্রাকে—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে শিবেন্দু।

—কিছু যেন মনে করিসনে শিবু বললুম বলে,—কিন্তু হয়েই বললে খগেন।

—মনে করার কি আছে, ফ্যাক্ট ইজ ফ্যাক্ট—ম্লান হাসলো শিবেন্দু।

চৌরঙ্গী রোডের মোড়ে এলো ওরা।

খগেন বললে, তাহলে চ কোথাও গিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিই।

—আমি আজ আর নয় খগেন, আমি চলি, আজ তোরা না হয় যা।

—মন খারাপ করার কি আছে এতে ? এমন কিছু একটা ব্যাপার নয়। চ'তো এখন, খাবি না খাবি সে পরের ব্যাপার। এস হে কবি—পিছন ফিরে বললে খগেন।

শিবেন্দু আর কথা বাড়ালে না, চললো ওদের সঙ্গে। ভাবছে অনেক কিছুই শিবেন্দু চলতে চলতে। বারে বারে বাড়ীর সকলকে মনে পড়ছে ওর। চিত্রা, বিচিত্রা, সুচিত্রা, মা, বাবা সবাই একে একে ভেসে আসছে শিবেন্দুর মনের কোনে—চিত্রা কত নিরীহ নম্র ; ঠিক যেন আজকের দেখা মেয়েটির মত সুন্দর, কিন্তু কোথায় যেন সরে যাচ্ছে ; ওকে তো দেখতে পাওয়া যায় না—কি ব্যথা ওর ? এদিকে বিচিত্রা তো নেমে চলেছে, কোথায় যাবে তা ঠিক নেই। আর সুচি ? সে তো ঘুড়ির মত এখানে ওখানে

ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাই যেন আলগা। কিন্তু সুস্থ কি করা যায় না এদের! করবে কে? মা! যার জীবনটা শুধু স্থূলকে চোখে ধরিয়ে দেয়, খুঁচিয়ে তোলে লোভ, নীচ স্বার্থপর হতে শিক্ষা দেয়—সে করবে! দিবুটার প্রতি কি দুর্ব্যবহার—বেহিসেবী কল্পনা-প্রিয় ছেলেমানুষ ওর মন, দরদে ভিজিয়ে দিলে হয়ত কিছু দিতে পারতো সমাজকে। কিন্তু ঘৃণা আর অবজ্ঞা ছাড়া আর কি দিয়েছে মা ওকে। হতভাগা করে ছাড়লে ওকে। মানুষকে অসুস্থ চোখে দেখে আজ দিবু। পয়েণ্টলেশ্ লাইফ্—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে শিবেন্দু চলতে চলতে। আর বাবা?—একটা হিপোক্র্যাটের মতই ধর্ম্মের আড়ালে সরে দাঁড়িয়েছেন। যাদের জন্ম দিলেন তাদের ভাল-মন্দে তাঁর কিছু এসে যায় না। ধর্ম্ম যদি সৃষ্টির প্রতি বিমুখই করলো, কি লাভ আছে তাকে আশ্রয় করার। সুস্থ জীবন মন ওতে কোনদিন সন্তুষ্ট হয়নি, হবেও না কোনদিন। নেশার লোভ দুর্বার। বাবা জরে গেছেন ঐ ধর্ম্মের নেশায়, তাই যোগসূত্র নেই সৃষ্টির সঙ্গে অন্তরের।—নিজ মনেই হাসলো শিবেন্দু। নিজেকে ব্যঙ্গ করার মত ওর হাসি। নিজে সচেষ্ট কোথায়, সচেষ্ট হলে কি ক্ষতিপূরণ হবে? হয়ত হবে, হয়ত হবে না। হয়ত সে ব্যক্তিত্ব নেই তার। তবে কেন ভাবছে সে? যুগটা ব্যক্তিত্বের, মানুষের নয়। তবু একক মানুষ হিসেবে তো চেষ্টা করা উচিত—শিবেন্দুর চেতন-মন ছাড়ে না ওকে। বারে বারে আঘাত করতে থাকে।

বিকেলে বাসন্তী মিঃ সোমের সঙ্গে বেড়াতে বেরুলে শঙ্করের কালো গাড়ীটা এলো নির্জন নীড়ে।

কিছুক্ষণ বাইরের বারান্দায় বসলো শঙ্কর। কিন্তু সুচিত্রা তো আজ আর ছুটে এলো না চঞ্চল হরিণীর মত। শঙ্কর অসোয়াস্তি অনুভব করে এই নির্জনতায়। নির্জনে নিশ্চুপ হয়ে ভাবতে পারেনা শঙ্কর। কেমন যেন ভয় করে তার। কে যেন মাথায় এসে ভর করে ভূতের মত। কৈফিয়ৎ তলব করে। উঠে পড়লো তাই শঙ্কর, তারপর উচ্চ স্বরে ভোলাকে ডাকলো।

ভোলা এলে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করে,—সুচিত্রা আছে ?

—না তিনি বেরিয়েছেন।

—কোথায় গেছে জানো কি ?

—নাতো।

—আমাকে কিছু বলতে বলে যায় নি ?

—কই, কিছু বলে যাননি তো।

—ও, আচ্ছা,—শঙ্কর নিরাশ-স্বরে বললে ; তারপর সোজা মোটরটার দিকে চলে এলো। কদিন ধরেই সে এসে ফিরে যাচ্ছে। কি ব্যাপার, সুচি কি তাকে আমল দিতে চায় না নাকি ? কিন্তু কেন ? বেশ কয়েকদিন আগেও সুচিত্রা ছিল ঘনিষ্ঠ। কে জানে, আবার নতুন কোন মক্কেল জুটলো কি না। কিন্তু সে কি করবে—কোথায় যাবে ?—বাড়ীতে, হিষ্টিরিয়া গ্রস্থ স্ত্রীর সঙ্গে সোহাগ করতে ! না, এ অসম্ভব। স্ত্রীর ছায়া দেখতেও রাজি নয় সে। তার চেয়ে ক্যাসানোভায় যে-কোন নাম-না-জানা মেয়ে আর রঙ্গীন পানীয়ের সঙ্গে তার বেশ

কাটবে সময়টা। বিচিত্রা হাত-ছাড়া হয়েছে হোক, সুচিত্রা যাচ্ছে যাক্, কিন্তু এরা থাকবে, টাকার বিনিময়ে যত খুসী পাওয়া যাবে —শঙ্কর গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলো। বেশী ভাবতে তার ভাল লাগে না।

.

সুচিত্রা বেরোয়নি কোথাও। কদিন ধরে সে কেমন আড়ষ্ট, ভীতু। নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে বিচিত্রার ঘরের মধ্যে। কারো সঙ্গেই দেখা করতে মন তার চায় না। অন্ধকার হয়ে গেছে তার সমস্ত জীবনটা যেন হঠাৎই।

সুচিত্রার রিরংসু-মন আজ সৃষ্টির আওতায় এসে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। কাঁপছে সে সৃষ্টির সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

—একি হলো মাগো—উপুড় হয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে সুচিত্রা। কিন্তু তাকে কে দেবে সান্ত্বনা; নীড়ে তো কেউ নেই আজ এমন! কেউ দরদ দিয়ে মুছিয়ে দেবে না তার সব কলঙ্ক। কেউ বলবে না,—যে দিলো সে বড় নয়; সে হতে পারে নীচ অধম, কিন্তু যে আসছে সে পবিত্র সুন্দর, পৃথিবীর স্পর্শ দিয়ে যত্ন দিয়ে তাকে আরো সুন্দর করো—তার বদলে তাকে এ বাড়ী থেকে দূর করে দেবে। কেউ ফিরে তাকাবে না তার দিকে আত্মীয়তার সুরে।

—মাগো, আর যে পারি না ভাবতে। কেন, কেন এমন করলাম—অনুশোচনার তীব্র জ্বালায় জ্বলে যায় সুচিত্রা। জ্বলতে জ্বলতে সে হয়ত পুড়ে যাবে; কোনদিন হয়ত বেঁচে থাকবে না পরিচিত মানুষের মনে।

আগুন লেগেছে। জ্বলার যুগ। শান্তিপ্রলেপ নিয়ে রাক্ষস পালিয়ে গেছে।

আর একজনও ঠিক এমনি করে জ্বলছে। সারা জীবন ধরে হয়ত জ্বলতে থাকবে চিত্রা। মানুষকে আর বিশ্বাস করবে না ও। সবাই তো ভণ্ড; মুখে এক, মনে এক—চিত্রা বিশৃঙ্খল ঘরটায় বসে অশোকের দেওয়া বইগুলোতে আগুন ধরায়।

—ধর্ম্ম হচ্ছে! পুড়ে যাক্ সব, জ্বলে যাক্ মানুষ আর তার ধর্ম্ম—অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে চিত্রা ঐ আগুন-ধরা বইগুলোর দিকে।

বাসন্তী ফিরে এসেছেন নীড়ে। নিশ্চুপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আবছা অন্ধকারে সারা নীড় আচ্ছন্ন—অব্যক্ত বেদনায় ক্ষয়ে যাওয়ার মত। বাসন্তীর ভাঙ্গা মনটা আরো যেন হতাশ হলো। আশ্রয় আজ ব্যথার সুরে ভরা। কেমন করে কি নিয়ে বাঁচবেন তিনি এখানে! তবু নীড় হাতছানি দেয়। অনেক নিবিড় যোগ যে তাঁর সঙ্গে নীড়ের।

আস্তে আস্তে সিড়ি ভেঙ্গে ভেতরে এলেন বাসন্তী। ভোলা দোতলার সিঁড়িটার একটা ধাপে বসে গালে হাত দিয়ে বসেছিলো। তারও ভাল লাগছে না যেন আর; বেদনার ছোঁয়াচ লেগেছে হয়ত তার মনে।

বাসন্তীকে দেখে ভোলা উঠে দাঁড়ালো।

বাসন্তী চাইলেন একবার ভোলার দিকে। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উপরের সিঁড়িতে পা বাড়ালেন।

—মা—ভোলা ডাকলো। স্বরটা একটু কাঁপা ওর।

বাসন্তী ফিরলেন।

—কিছু তো বুঝতে পারছি না মা আপনাদের ব্যাপারটা, তা আমাদের ছুটিই দিয়ে দেন, চলে যাই কোথাও,—মুখ নীচু করলো ভোলা।

—কি হলো আবার—বড় ক্লান্ত বাসন্তীর স্বর।

—বাড়ীতে মনিষ্যি থেকেও লাই, রান্নাবান্না লষ্ট হচ্ছে, মেজদিদিমণি দুদিন খায় লাই, সুচিদিদি সকাল থেকে ঘরে পড়ে পড়ে কাঁদছে, আর ছোট দাদার কথা কি আর বলবো—ভোলা হাত উলটিয়ে কথা শেষ করে চেয়ে থাকলো বাসন্তীর মুখের দিকে।

বাসন্তীর সারা শরীরে কাঁপন এনে দেয় ভোলার কথাগুলো। চিত্রা দুদিন খায়নি, সুচি খায়নি সকালে, দিবু ছন্নছাড়া। আর আমি ওদের মা হয়ে কোন খবর রাখি না। বাসন্তী চোখ বুজলেন; নিজের এ রূপ সহ্য করতে পারছেন না তিনি। লজ্জায় মন মাটিতে মিশে যেতে চাচ্ছে। ভগবান এ তুমি কি বুদ্ধি আমায় দিয়েছিলে; নিজের সন্তানদের একি করেছি আমি! নিজেকে ধিক্কার দিয়ে দোতলায় উঠে এলেন বাসন্তী। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে চিত্রার ঘরের দরজায় মৃদু আঘাত করলেন। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ভয় পেলেন বাসন্তী, কাঁপা স্বরে ডাকলেন,—চিত্রা, দরজাটা খোল মা।

কোন সাড়া নেই।

—একবারটি খোল মা, খাসনি যে দুদিন তুই—কান্নায় গলা ভেঙ্গে যায় বাসন্তীর।—আমি যে তোর মা, ওরে আমার কথা রাখ—আঘাত করেন বাসন্তী দরজায় বারে বারে।

এবার দরজা খুললো চিত্রা।

—একি করেছিস মা, মেয়েকে বুকে চেপে ধরেন বাসন্তী।

চিত্রা নিশ্চুপ। কথা নেই। দৃষ্টি ওর স্থির। কাঁপন নেই কোথাও। দুপুরের স্থির রোদের মত রুক্ষতা ফুটে উঠেছে ওর সারা শরীরে।

—কি হয়েছে মা বল না,—ওরে আমাকে বল তুই।

এবার চিত্রা ম্লান হেসে আস্তে আস্তে বললে, এমন কিছুতো হয়নি আমার।

—লুকোচ্ছিস কেন তুই আমার কাছে?

চিত্রা চেয়ে থাকলো মার দিকে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর দূর মাঠ থেকে ছোট কুঁড়ের কাছে আস্তে আস্তে বৃষ্টি আসার মতই ওর স্তব্ধ মন কান্না হয়ে ঝরে পড়লো। মার বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো চিত্রা—আর বিশ্বাস করবো না, কোনদিনও ভুল করবো না। মা, ওরা ঠকায়, ছিনিমিনি খেলে শুধু। তুমি কেন আমায় বলে দিলে না মা।

বাসন্তী চোখ বুজলেন, আস্তে আস্তে চিত্রার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন—অধীর হসনি মা, ভেঙ্গে পড়িসনে, সংসারে আঘাত আসবে, সহ্যও করতে হবে আমাদেরই বেশী করে মা। স্থির হ' তুই।—নিজের আঁচল দিয়ে চিত্রার চোখ মুছিয়ে দিলেন

মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁধে মাথা রেখে চোখ বোজে চিত্রা।

—কিছু খাবি চ দেখি মা।—খুব মিষ্টি স্বর বাসন্তীর। এ যেন অনেক আগের পুরোণো বাসন্তী ফিরে এসেছেন। ছোট্ট অজয়ের সেই লাল পেড়ে শাড়ীপরা মিষ্টি মায়ের মত স্নেহের জোয়ারে ফুলে উঠছেন বাসন্তী।

চিত্রাকে খেতে বসিয়ে দিয়ে কতকটা শান্ত হয়ে সুচির খোঁজে এলেন বাসন্তী। সুচিত্রার ঘরের দরজা খোলা। একরাশ অন্ধকারে ভরা সারা ঘরটা। কে জানে এ মেয়ের আবার কি হলো? এমনটাতো সুচি করে না কোনদিন—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আলো জ্বাললেন বাসন্তী।

বিবশ সুচিত্রা উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ফোঁপাচ্ছে তখনও মাঝে মাঝে ও। কান্নার শক্তি ফুরিয়ে গেছে ওর।

বাসন্তী আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন সুচির কাছে। খাটে বসে ওর মাথায় হাত রাখলেন। তারপর খুব ধীর নরম স্বরে বললেন,—কাঁদছিস্ কেন মা?

সুচিত্রা চমকালো বাসন্তীর জিজ্ঞাসায়। আস্তে আস্তে চোখ তুললো ও মার দিকে!—এত দরদ তার জন্যে এখনও আছে! বিশ্বাস করতে চায় না ওর মন—চেয়েই থাকলো সুচিত্রা ফ্যালফ্যাল করে বাসন্তীর দিকে।

—কথা বল মা, কষ্ট হচ্ছে খুব? লক্ষ্মীসোণা মেয়ে, কি হয়েছে? আমি দেখাশুনা করিনি বলে রাগ হয়েছে মা?—আদর করে মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন বাসন্তী।

এত দরদ এত আদর! ঠোঁটটা কেঁপে ওঠে, চোখ ছাপিয়ে জলের ধারা নামে সুচিত্রার।

—আচ্ছা চ তো খেতে খেতে বলবি সব, যা বলবি তাই করবো, এবার ওঁর পেনশন এলে সেই ইয়ারিংটা কিনে দেবো, কেমন হলো তো—বুকের কাছে টেনে নিলেন সুচিত্রাকে বাসন্তী।—বড় আদরের ছোট মেয়ে তাঁর যে সুচিত্রা।

সুচিত্রা তবু নিশ্চুপ; ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে চেয়েই থাকে বাসন্তীর মুখের দিকে।

—লক্ষ্মী মা, আর আমায় কষ্ট দিসনি তোরা সবাই মিলে, চ খাবি চ।

সুচিত্রা এবার হঠাৎ বাসন্তীর বুকে মুখ ঘসতে ঘসতে ককিয়ে কেঁদে উঠলো,—তুমি শুদ্ধ ঘৃণা করবে যে মা।

বাসন্তী আতঙ্কে শিউরে উঠেন। দুঃসময় এসেছে তাঁর, হয়ত তাঁরই খেয়াল-খুসিতে সুচির জীবনটাও নষ্ট হয়ে গেছে—হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে যান বাসন্তী। আস্তে আস্তে কাঁপা ভীতু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন,—কি হয়েছে তোর? বল না কি হয়েছে?

—আমার সর্বনাশের কথা কি করে বলবো, কি করে বলবো তোমায়।

—আমি তোর মা যে, ওরে কোন ভয় নেই, বল।

সুচিত্রা যন্ত্রণায় বাসন্তীর বুকে মুখ ঘসতে ঘসতে বলে উঠলো—কেন তুমি ঐ বদমাস লোকটার সঙ্গে মিশতে বললে? তুমি তো জান না কি শয়তান লোকটা—আমি যে বুঝতে পারিনি।

বাসন্তী কাঁপছেন, হাত পা শিথিল হয়ে আসছে।—তবে কি ঐ রেণ্টুর ছেলে ওর পেটে—শিউরে উঠে চোখ ঢাকলেন

বাসন্তী। আবার সমস্ত অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে তাঁর—কি বলবেন কি করবেন! সবই তো তাঁর জন্যেই, তাঁরই ভুলে মেয়েগুলো নষ্ট হয়ে গেল! কুঁকড়ে গেলেন বাসন্তী নিজের কাছেই। বিচারকেরা ঘিরে ধরেছে, উৎকোচ-মুঠি বন্ধ, আর কোন পথ নেই তাঁর বেরুনোর।

রাত খুব বেশী হয়নি। দশটা বেজেছে সবে। দিব্যেন্দু সকাল সকাল ফিরলো নীড়ে। আস্তে আস্তে নির্জন বাগানটা পেরিয়ে বাড়ীর কাছে এলো ও। বাড়ীতে কি লোকজন নেই! এত সকালেই নিশ্চুপ হয়ে গেছে সারা বাড়ীটা। কোন ঘরেই আলো জ্বলছে না। কে জানে কোথায় গেছে এ বাড়ীর জীবন—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে দিব্যেন্দু।

আজ দিব্যেন্দুর ক্লান্তি নেই। পরিশ্রম অনেক হলেও, মনটা আজ ওর শুধু বেদনা-ভারাক্রান্ত। অণিমা ওকে ওর বিগত জীবনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। সেই মধুর শান্ত সরস জীবনের জন্যে মনটা কাঁদতে থাকে ওর। নিকট আত্মীয়-স্বজনকে কাছে পেতে ইচ্ছে করছে। সবাই আসুন তাঁরা—নবানী, মা, বাবা, বোনেরা, মাসিমা; ভরিয়ে দিক তার সব শূন্যতা—কিন্তু কি ভাবছে সে—ফিরে কি আসতে পারে ওরা, মরে গেলে পুড়িয়ে দেয়, স্মৃতিও চলে যায়। সেতো মরে গেছে ওদের কাছে।

ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে এলো দিব্যেন্দু। তারপর অন্ধকারেই অভ্যাস মত বিছানায় শরীরটা এলিয়ে

দিলে। হাতে কি যেন একটা ঠেকলো। এ কি এটা—ভাল করে স্পর্শ করলো দিব্যেন্দু হাতে তুলে। চিঠির খাম। কে আবার চিঠি দিলে—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আগের ভাবনার ইতি করে আলো জ্বালতে উঠলো।

মেয়েলী হস্তাক্ষরে তার নাম আশমানী রঙের লেফাপার উপর আলো পড়ে জ্বলজ্বল করছে—অনেকক্ষণ ধরে দিব্যেন্দু দেখলো। অতি পরিচিতজনের হস্তাক্ষর—যার কথা কিছুক্ষণ আগে খুব ভাবছিলো সে। চিঠিটা খুলতে কেমন মায়া হচ্ছে। ভেতরে কি আছে কে জানে। উপর দেখে নিজের মনের মত করে কিছু ভেবে নেওয়াটাই লাভ। দিব্যেন্দু লেফাপার দিকে চেয়ে বসে রইল।

অনেকক্ষণ বাদে ধীরে ধীরে চিঠিটা খুললো, তলার নামটা আগে দেখলো দিব্যেন্দু—নবানী চিঠি লিখেছে, ছোট্ট চিঠি। কয়েকটা কথার একটি সংবাদ।

—"বিয়ে করেছি। বাড়ীর মতে নয়, আইনের সাহায্যে—নিজের মতে। যাকে স্বামীর সম্মান দিলুম সে সব দিক থেকেই অনেকের উঁচুতে। আশা করি খুসী হবে।"—ইতি, নবানী।

চিঠিটা কয়েকবার পড়লো দিব্যেন্দু। তারপর একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে হাসলো চিঠির দিকে চেয়ে। মন ওর নরম সুরে কথা বলে চলে।—আঘাত দিতে চেয়েছো নবানী, ও আঘাত সয়ে যাবে। উঁচুদরের লোক তো আমি নই। তোমার স্বামীর সঙ্গে তুলনা করে তাঁরই সম্মানহানি করেছো নবানী—পথের মানুষ আমি, বিরাট খোলা আকাশের নীচে

দিয়ে পথ হাঁটাই আমার পেশা, তুমি তো গ্রহণ করতে না এ-পেশার ধারককে, এ তো আমি জানতুম, তুমিও জানতে। তবু আমাকে ব্যঙ্গ করে নিজেকে ছোট করলে কেন! দিব্যেন্দু বেদনায় কেঁপে ওঠে নবানীর জন্যে। হয়ত চিনবে না আর, দেখাও হয়ত হবে না; বলতে পারবো না তোমাকে কিছুই, শুধু কামনাই করবো তোমার আজকের নতুন জীবন যেন সার্থক হয়ে ওঠে। চোখ বুজলো দিব্যেন্দু। আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে তার মন— নবানীকে ছেড়ে খোলা আকাশের নীচে আঁধার-আলোর সন্ধিক্ষণে পথের সামনে। সামনে পথ বেয়ে উলুখড়ের মত অসংখ্য মানুষ চলছে। ভীড়ের মাঝে মিশে গেল দিব্যেন্দু। তারপর কে যেন ভীড় ঠেলে তার পাশে এসে দাঁড়ালো, হেসে বললে,—তোমার কষ্ট হচ্ছে না তো?

—কে তুমি! আরে অণিমা, তুমি? তুমি এসেছো! —আমিই তো আসবো,—হাসলো অণিমা; কি সুন্দর অদ্ভুত হাসি। পথের কষ্ট মুছিয়ে দেবে যেন—দিব্যেন্দু ওর হাত ধরতে যায়।—একি কি হলো—হঠাৎ তন্দ্রা কেটে গেল দিব্যেন্দুর। চোখ কোচলে ভাল করে চাইলো—স্বপ্নই দেখছিলো তাহলে—কোথায় অণিমা, কোথায় অসংখ্য মানুষ। নীড়ে তারই ঘরে বসে সে, সামনে নবানীর চিঠি খোলা রয়েছে তখনও। দিব্যেন্দু চেয়ে থাকলো বেশ কিছুক্ষণ নবানীর চিঠিটার দিকে। তারপর বিছানা ছেড়ে টেবিলের কাছে এসে চিঠিটা সযত্নে তুলে রাখলো দিব্যেন্দু। নবানীর শেষ চিঠি,—মূল্য ওর অনেক; জীবনের অনেকখানি উত্তাপের বিনিময়-লব্ধ সম্পদ—হ্যাঁ সম্পদই তো—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দেরাজটা বন্ধ করে দিলে

দিব্যেন্দু। তারপর আলো নিবিয়ে দিয়ে ঘর থেকেবেরিয়ে এলো সে। ঘর ভাল লাগছে না তার। বাইরের অন্ধকারে তারা-ভরা আকাশের তলে বসে বসে আবার যদি ভাবতে পারে সে। আবার যদি আসে সেই নারী অনেক পথ বেয়ে অনেক খুঁজে খুঁজে!—কে জানে হয়ত বা মন তার স্থির হবে সূর্য্য-বন্দনায়।

ঐ পথ আর আকাশ হাতছানি দিচ্ছে, আপন বৈভব দিয়ে তার সব গ্লানি মুছে নিতে।—দিব্যেন্দু বাড়ী ছেড়ে ধীরে ধীরে নীড়ের বাগানে নেমে এলো।

রাত গভীরের প্রান্তে। গম্ভীর স্তব্ধতা তখনও কাটেনি। বাসন্তী আর পারছেন না। অনেকক্ষণ একা একা বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেঁদেছেন অনুশোচনায়। জ্বলছেন, ছটফট করেছেন অসোয়াস্তিতে—অপরাধের ভয়ে কুঁকড়ে গেছেন বাসন্তী। কিন্তু বিচারকের সামনে যেতে পারলেন কই।

আর তো পালিয়ে থাকতে পারছেন না। ও ডাকছে তাকে যেন গম্ভীর স্তব্ধতার মত করে—বাসন্তী বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। নীচে নামলেন। চারিদিকে জমাট অন্ধকার। ধীরে ধীর এগিয়ে গেলেন বাগানের দিকে।

রাত শেষে বাগানের শেষ প্রান্তে প্রভাতের প্রস্তুতি। ছোট্ট কুঁড়ে ঘরের জানালা দিয়ে রাসবিহারী শুকতারাটার দিকে চেয়ে চেয়ে ধীর ঠাণ্ডা সুরে গেয়ে চলেছেন ঃ—

দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ শিশির বসন্তৌ পুনরায়ত।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদাপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ু।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ় মতে।

ধীরে ধীরে বাসন্তী এলেন ঠিক এই সময়। রাসবিহারীর সুরেলা কণ্ঠ যেন তাঁর সব অপরাধ ক্ষমা করেছে। বুকের ভেতর কে যেন বলছে, আমাকে ওঁর স্পর্শ দাও—আমি আর পারছি না। অনুভূতির সূক্ষ্ম তারগুলো কাঁপছে ওঁরই স্পর্শের জন্যে। চোখে তারই আভাস—অশ্রুর ধারা নেমেছে বাসন্তীর দু'গণ্ড বেয়ে। এগিয়ে গেলেন বাসন্তী নির্ভয়ে রাসবিহারীর কাছে। তারপর আর পারলেন না। লুটিয়ে দিলেন নিজেকে রাসবিহারীর পায়ে।

রাসবিহারী চমকালেন। তারপর স্পর্শ করলেন বাসন্তীর মাথাটা। আস্তে করে জিজ্ঞেস করলেন,—কে, বাসন্তী? ছিঃ কাঁদতে আছে কি!

—ওগো আমাকে তুমি আদর করো না, তুমি জানো না আমি কি পাপ করেছি। তুমি কত ভালো আর আমি—ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন বাসন্তী রাসবিহারীর পায়ের পাশে মুখ ঘসতে ঘসতে।

রাসবিহারী আস্তে আস্তে বাসন্তীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন,—তুমি খারাপ তো নও বাসন্তী, খারাপ হলে আমিও যে নীচে নেমে যেতাম; তুমি শুধু বাইরের জৌলুসে ভুলেছিলে কিছুদিন, আর আমি জানতাম তুমি ফিরে আসবে। ছিঃ ওঠ—মুখ তোলো। আলোটা জ্বালো তো, আলোতে দেখি তোমাকে—কতদিন যে ভাল করে দেখিনি তোমায়। রাসবিহারী দরদের স্পর্শ দিয়ে বাসন্তীকে তুললেন পায়ের কাছ থেকে। রাসবিহারীর বুকে মাথা রেখে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠলেন বাসন্তী। —কেন তুমি আদর করে কাছে টানলে,—ওগো, তোমার ছেলে-

মেয়েদের জীবন নষ্ট করেছি যে আমি ; তাদের নীচে নামিয়েছি আমাকে শাস্তি দাও—ওগো শাস্তি দাও।

নীড়ের অতন্দ্র রাত্রির ভোর হোল। সাদা নীড় কুয়াশায় ক্লান্ত চোখ মেললো—সিগারেট টানতে টানতে দেখছিলো শিবেন্দু বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে। কাল রাতে ও বাড়ী ফেরেনি। কেন যেন ভাল লাগেনি ওর। খগেনের ওখানেই ছিল। রঙীন নেশা করেনি, তবু শিব্যেন্দু সারা রাত ধরে একটার পর একটা সিগারেট টেনেছে আর নানা চিন্তার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে। চিন্তার রূপান্তর ছিল কিন্তু বিষয় ছিল এক। বিচিত্রা দিব্যেন্দুর মত মানুষ একই পরিবারে থেকে এ রকম দুটো আলাদা অসুস্থ জীবন বেছে নিলে কেন? সে-ই বা পারলো না কেন ওদের মত আর এক ধরণের অসুস্থ জীবনে যেতে? কারণটা কি? সারা রাত ধরে ভেবেও কিছু ঠিক করতে পারেনি শিবেন্দু! শেষ রাতে কি খেয়াল হলো, শ্যামবাজার থেকে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী চলে এলো।

—সত্যিই মায়া লাগে বাড়াটা দেখলেই—শিবেন্দু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সিগারেটটায় শেষ টান দিলো। তারপর গেট খুলে বাগানের ভেতরে এলো।

একটু এগোতেই শিবেন্দু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সামনের দিকে—বাবা আর মা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছেন বাবার ছোট ঘরটার দিকে। এত ভোরে বাবা মাকে একসঙ্গে অনেকদিন বাদে দেখলো শিবেন্দু। একটু বিস্ময় লাগে তাই।—কি ব্যাপার কে জানে। দীর্ঘ

বিচ্ছেদের পরও বোধহয় আবার বিচ্ছেদটাকে ঝালিয়ে নেবার নতুন কোন ঘটনা ঘটলো—ম্লান হাসির রেখা ফুটে ওঠে শিবেন্দুর ঠোঁটের কোণে। সত্যিই অদ্ভুত বিচিত্র লাগে নারী-পুরুষের মনকে! হদিস মেলে না। তার ওপর তাদের আচরণ—বোঝাই মুস্কিল। একটি ঘটনার আগে মানুষকে যে চোখে দেখলুম, ঘটনার পরে সে মানুষ সম্বন্ধে ধারণা করলুম অন্য। তাহলে মানুষের স্থিতি কি ঘটনাই নিরূপন করবে?—দূত্তোর, কি ভাবছি, কোথা থেকে কোথায় চলে এলুম—শিবেন্দু মাথাটা বার দুই ঝাঁকি দিয়ে এগিয়ে চললো।

—কোথায় গেছ্‌লি এই সকালে?—ভোরের মত শান্ত হাসি হাসলেন রাসবিহারী শিবেন্দুর দিকে চেয়ে। বাসন্তীও সস্নেহে চাইলেন শিবেন্দুর দিকে।

কেমন যেন আশ্চর্য্য লাগে শিবেন্দুর মা বাবাকে। মার এমনি শান্ত নরম বিষাদের মুখচ্ছবি কোনদিন দেখেনি শিবেন্দু। আর বাবা যেন এক বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রতীক্—আস্তে আস্তে মাথাটা নীচু হয়ে এলো শিবেন্দুর। কয়েকটা মুহূর্তের পর শিবেন্দু মাথা তুলে বললে,—খগেনের কাছ থেকেই আসছি।

—কাল ওখানেই ছিলি বুঝি, তা এতো ভোরে কি করে এলি?

শান্ত ছোট্ট ছেলের মত শিবেন্দু বললে,—হেঁটে এলুম, ঘুমুতে পারলাম না যে।

—দূর পাগোল, ঘুম হলো না বলে সেই শ্যামবাজার থেকে হেঁটে চলে এলি শুধু মুধু তুই!—রাসবিহারীর স্বর স্নেহভরে জড়ানো।

শিবেন্দু বাবাকে দেখলো—এ যেন নতুন, প্রাণ-প্রাচুর্য্যে ভরপুর। কৃপণ নয় বাবা আজ, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ততাইবা কোথায়! —ধর্মের নেশাখোর বলে তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই তো পূর্ণ মানুষ, সুস্থতার জোয়ারে সবদিক ভরা।—মনে মনে বাবাকে প্রণাম করলো শিবেন্দু।

—ওগো, ভোলা উঠলো কিনা দেখ না, উনুন ধরাতে বলো, শিবুকে চা করে দিক। বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে,—রাসবিহারী বললেন বাসন্তীকে। তারপর তিনি শিবেন্দুর দিকে ফিরে বললেন, —তুই যেন ঘুমোসনি এখন, শরীর খারাপ হবে।

এমন নির্ভেজাল দরদ চাপা থাকে কি করে!—শিবেন্দু ভেবে কুল পায় না।

বাসন্তী আস্তে আস্তে বাড়ীর ভেতর গেলেন। রাসবিহারী শিবেন্দুকে বললেন,—আয় আমরা বারান্দাটায় বসি।

বারান্দায় উঠে এসে শিবেন্দু তার বাবার সামনাসামনি বসলো বেতের চেয়ারে। এত ঘনিষ্ঠ হয়ে বাবার সঙ্গে অনেককাল বসেনি শিবেন্দু। অবাক হয়,—সবই কেমন আশ্চর্য্য লাগে ওর।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ দু'জনই। তারপর এক সময় রাসবিহারী ম্লান হেসে বললেন,—বাড়ীর খোঁজ বোধহয় রাখিস না?

এবার মনে ব্যথার ছোঁয়াচ লাগে শিবেন্দুর। কোন দায়িত্ব নেয় নি, বাড়ীর কোন খোঁজই সে রাখে না; শুধু ওপর থেকে সমালোচনা করেছে,—এগিয়ে এসে কিছু তো করে নি সে। হঠাৎ বিচিত্রার কথা মনে হলো শিবেন্দুর —চিত্র-প্রদর্শনীর সেই বিচিত্রা হয়ত নাও সৃষ্টি হতে পারতো

তাহলে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শিবেন্দু শুধু আস্তে করে বাবাকে বললে,—না।

—তোদের সবার মুখে এক কথা। কিন্তু কেন? এ বাড়ীর কেউ কি কারো আপনার নয়?

—কথা ঠিক তা নয় বাবা। এ বাড়ীর পরিবেশ এমন একটা স্তরে এসেছে যেখানে এ বিরাগ আসতে বাধ্য হয়েছে। কেউ কারো খোঁজ রাখে না। হয়ত মা-ই দায়ী। চিন্তা করি, দুঃখ করি—আমার ভাইবোনদের জন্যে। কিন্তু কেন যেন এগুতে গেলেই অবশ করে দেয় মনটাকে। টাকাটাকেই আমাদের সংসারে বড় করে দেখা হয়েছে। মা মুগ্ধ ছিলেন ঐ টাকায় আর ঠুনকো মর্য্যাদায়, তাই নীতির রকমফের হয়েছে। স্নেহ ভালোবাসার নরম পলি আমাদেরকে সরস করেনি, টাকার গরমে ফাঁক স্থষ্টি করেছে—নিজের খবর নিজেকে রাখার আগ্রহটাও মরে যাওয়ার মত। খোঁজ রাখার তাগিদ তাই বোধহয় নেই।—এক সঙ্গে অনেকগুলো কথা বললে শিবেন্দু ভিজে মনের তাগিদে।

রাসবিহারী শুনলেন একমনে ছেলের কথাগুলো। মুখে ভাবান্তর নেই তাঁর। চেয়ে থাকলেন শুধু তিনি তাঁর মেজছেলের, দিকে।—না এ ছেলের প্রাণ আছে, ধারও আছে। হয়ত এই ভাঙ্গা পরিবারটাকে নতুন আলো দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে ও। সুস্থ প্রাণের, আনন্দের সংসার স্থষ্টির সময় এসেছে। এই ছেলেই এ সংসারের নতুন মাংগলিক—থর থর করে কেঁপে উঠলেন যেন রাসবিহারী। কম্পিত স্বরে শিবেন্দুকে বললেন

—সবই বুঝলুম, কিন্তু বাবা এদিককার খবর জানিসতো ; বিচিত্রা আজ দু'দিন হলো বাড়ী নেই, সুচিটা অসৎ সঙ্গদোষে সন্তান-সম্ভবা শুনছি, চিত্রার মত ভালো মেয়ে আজ মরতে প্রস্তুত, আর দিবু, তাকে জানিসতো ; জীবনের কোন মূল্যই নেই ওর কাছে। তুই বল বাবা, বড় হয়েছিস তুই, সৎ শিক্ষায় জীবনকে চিনেছিস্ তুই, তুই কি ওদেরকে বাঁচাতে পারবি না ? তোর প্রাণশক্তিতে ওদেরকে নতুন করে গড়ে তোল—পারবি না বাবা ?—রাসবিহারীর চোখে জল, তিনি ভেজা চোখে চেয়ে রইলেন শিবেন্দুর দিকে।

শিবেন্দু স্তব্ধ—বাবার চোখে জল! কোনদিন যা কেউ দেখেনি। এমন করে হৃদয় ঢেলে দিয়েছেন তাঁর সৃষ্ট সন্তানদের ভাবনায়! আর কি ভেবেছে সে এই বাবার সম্বন্ধে—কান্নার জোয়ার যেন ভাসিয়ে দিতে চাচ্ছে শিবেন্দুকে।

—তুই তো বড়, সাধু তোর মন, তুই কথা দে শিবু—গলাটা ধরে যায় রাসবিহারীর। প্রক্ষোভের সুতীব্র কাঁপনে সম্বিৎ হারিয়ে ফেললেন তিনি ;—শিবেন্দুর হাত দুটো ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন রাসবিহারী।

—বাবা!—শিবেন্দুও চিৎকার করে কেঁদে ওঠে—আমি কথা দিচ্ছি বাবা, আমি দায়িত্ব নেবো—তুমি····তুমি····।—কথা হারিয়ে যায় কান্নায়। রাসবিহারীর হাঁটুতে মাথা ঢাকলো শিবেন্দু। কথা নেই। এক হয়ে গেছে পিতা-পুত্র—কোন ফাঁক্ নেই আর।

রাসবিহারী ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে এক সময় বললেন,—আশীর্ব্বাদ করি নিজেকে সকলের মধ্যে খুঁজে পা।

বাইরে মিষ্টি ভোরের সঙ্গে কাঁচা-সোণা রোদের মিতালি। অদ্ভুত!—একই সুরে কথা বলছে যেন হেসে হেসে। রাস-বিহারী আর শিবেন্দু ঐ সুরে মিলে গেছে।

বাসন্তী এলেন চায়ের ট্রেটা হাতে নিয়ে। সত্তস্নাতা বাসন্তীর এলো ভিজে চুল বাতাসে মৃদু-মিঠে গন্ধ ছড়ালো। আজ বাসন্তী পরেছেন সেই লালপাড় পুরোণো গরদের শাড়ী, রাসবিহারীর যা ভালো লাগতো। রাসবিহারী চেয়ে থাকলেন বাসন্তীর দিকে—সেই পুরোণো বাসন্তীই যেন ফিরে এসেছে; মৃদু হেসে স্বাগত করলেন রাসবিহারী।

টেবিলে ট্রেটা নামিয়ে রেখে বাসন্তী চায়ের কাপগুলি এগিয়ে দিলেন।

—ওগো শিবুকে সব বললুম। তুমি ভেবো না। ও আর আমরা মিলে চেষ্টা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। নাও, আগে বসো দিকি।—রাসবিহারী চায়ে চুমুক দিলেম।

—আর দেখ শিবু তোকে এখুনি একবার হাওড়া ষ্টেশন যেতে হবে, অত্রী আর দেবেন আসছে আজ সকালের গাড়ীতে!

গঙ্গোত্রী আসছে! সেই অত্রী; ছোট্ট মেয়েটা! কি খুঁনসুটি না করেছে সে—শিবেন্দুর মনে পড়ে গেল।—কি রেগেই না যেতো গঙ্গী বলে ডাকলে আর চুলের ঝুটি ধরলে; ফর্সা মুখখানা লাল হয়ে উঠতো। ভালো লাগতো ওকে রাগাতে। ছোটবেলার সাথী, তারই পরের বোন গঙ্গোত্রী; এতদিন কেন আসেনি? কেন ভাবেনি তাকে—শিবেন্দুর মন দুঃখ করে ওঠে।—বাবাই তো ফিরিয়ে দিলেন অত্রীকে।

—ছোট্ট দাদুটা কথা বলতে শিখেছে, বেশ ভাল করে হাঁটতে পারে নাকি দুষ্টুটা—খুশিতে ঝলমল করে রাসবিহারীর মুখ।

গঙ্গোত্রীর আর একটা ছেলে হয়েছে! সেই ছেলে হাঁটতে পারে, কথা বলে! আর সে খবর জানতো না—মনে মনে কেমন যেন লজ্জা পায় শিবেন্দু।

—কিছু টাকা দিয়ে দাও শিবুকে। সঙ্গে নিক, কি দরকার পড়ে না পড়ে।

—এখুনি যাবি নাকি তুই?—নরম মিষ্টি সুরে এই প্রথম কথা বললেন বাসন্তী।

শিবেন্দু মার দিকে চাইলো—বা ভারী সুন্দর তো! এ রূপ কেন আটকা পড়েছিলো মার। মাকে আজ ছোটবেলার সেই মার মত আপন মনে হলো শিবেন্দুর। ও খুসীর সঙ্গে হেসে বললে, —চান করে এখুনি বেরুবো।

—রাত জেগে আড্ডা দেওয়া একটু কমা দিকিনি; শরীরটা নষ্ট করে কি সাপের পাঁচ-পা দেখবি—বাসন্তী মিষ্টি ধমক দিলেন অনেকদিন বাদে।

শিবেন্দুর ভালো লাগে। ও হেসে বললে,—কমাচ্ছি তো আড্ডা।—কথা শেষে চায়ে চুমুক দিলো শিবেন্দু।

আজ কত সহজ যেন ও। হয়ত অন্তরের স্পর্শে এমনি হয়। কখন যে ঘরোয়া মনে ফিরে এসেছে জানতেই পারেনি শিবেন্দু। মার দিকে চেয়ে হেসে ও বললে, তোমায় কিন্তু আজ ভারী ভাল দেখাচ্ছে মা।

বাসন্তী হাসলেন মৃদু। রাসবিহারীও হাসলেন; তারপর বললেন,—তুই দেরী করিস নে, স্নান করে বেরিয়ে পড়।

—হ্যাঁ, এই যে উঠছি।

—অত্রী তোকে দেখলে কি খুসীই না হবে। তুই খোঁজ নিসনে বলে কত দুঃখ করে সে চিঠি লিখেছে। তুই আনতে গেলে সত্যি ও আনন্দ করবে।—কথা শেষ করে রাসবিহারী একটু চুপ করে বাসন্তীকে বললেন,—দেখো আজ কিন্তু আমি বাজার যাবো, অত্রী মোচার ঘণ্ট খেতে ভালবাসে না?

বাসন্তী ঘাড় নেড়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপলেন—তুমি কত ভালো; ছেলেমেয়ের খুটিনাটি ভালো-লাগা না লাগাও তোমার মনে আছে। আর আমি—চোখ বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল ঝরলো বাসন্তীর।

—আজ একটু বেশী খরচা করবো কিন্তু—বাসন্তীর দিকে চেয়ে হাসলেন রাসবিহারী।

বাসন্তীও হাসলেন মৃদু, বৃষ্টি শেষে রোদের মত।

—চিত্রা, স্থচি উঠেছে নাকি? আর দিবুকে কি ঘরে দেখলে?

—চিত্রা উঠেছে, স্নান করতে পাঠিয়েছি। স্থচি ঘুমুচ্ছে। সারা রাত ধরে কেঁদে কেঁদে ভোরে একটু বোধহয় ঘুমিয়েছে। দিবু তো ভোরের দিকে বেরিয়ে গেছে, ভোলা বললে,—ধীরে ধীরে বললেন বাসন্তী।

রাসবিহারী চুপ করে শুনলেন। তারপর চুপচাপ; কথা নেই। কি যেন ভাবছে সবাই।

—সুচির দিকে নজর রেখো। ছেলেমানুষ তো, কিছু যদি করে ফেলে। না হয় অত্রীর সঙ্গে পাঠিয়ে দেবো ও কে। —ধীরে ধীরে বললেন রাসবিহারী। আবার চিন্তার মধ্যে ডুবে গেলেন তিনি।

আবার সবাই চুপচাপ। সবাই ভাবছে। কিছুক্ষণ পর রাসবিহারী হঠাৎ আপন মনে বলে উঠলেন,—না হয় আমার নাতি স্বার্থপর সমাজের কাছে গোত্রহীন, কিন্তু আমার কাছে, শিবুর কাছে, তোমার কাছে মহাগোত্রের অধিকারী বলে কি পরিচিত হবে না?

—কেন হবে না, নিশ্চয় হবে; সত্য সুন্দর মানুষ বলে আমাদের আত্মীয় বলেই সে পরিচিত হবে। আমাদের এই মিথ্যা গোত্র তো আজ ধ্বংস হচ্ছে। ও মোহ কেটে যাবে। মানুষের সমাজে মানুষ বলেই পরিচিত হবে ও।—এই শিক্ষা মানুষতো পেতে আরম্ভ করেছে বাবা।—শিবেন্দু বিভোর হয়ে গেছে। আপন মনেই অন্তরকে মেলে ধরলো ও মা আর বাবার সামনে।

—তুইই তো পথের ইঙ্গিত দিবি বাবা—ভাবুক রাসবিহারীও ভাবে মিশে গেছেন।

—ওসব কথা এখন থাক্ না, এখনও তো ঠিক জানা যায়নি। কিছুদিন না গেলেতো কিছু বোঝা যাবে না।—বাসন্তী আস্তে আস্তে বললেন।

—তা বটে। আর দেবেন তো আসছেই, ও দেখে-টেখে কি বলে দেখ। তবে সুচির ছেলে হলে আনন্দই করবো, দুঃখ করবো না। যাক্, এখন থাক ও সব কথা, শিবু এবার ওঠ তুই, আর দেরী করিস নে।

—হ্যাঁ যাই, চানটা করে আসি।—শিবেন্দু উঠে গেল চেয়ার ছেড়ে।

শিবেন্দু চলে গেলে শুচি-স্নাতা বাসন্তী আস্তে আস্তে রাসবিহারীর পায়ের কাছে বসে মাথাটা লুটিয়ে দিলেন গভীর আবেগে।

রাসবিহারী চোখ বুজলেন। কয়েকটি নীরব মুহূর্ত। দেওয়া-নেওয়ার একটি সুন্দর সন্ধিক্ষণ। আত্মিক মিলনে আবার যেন ভরে উঠেছেন দু'জনে।

—ওরে ও চিত্রা, এদিকে আয় না। ও মা, দামালটার রকম দেখে যাও। এই দুষ্টু, কাঁচকলা মুখে দিওনা।—স্তূপীকৃত আনাজের মধ্যে বসে গঙ্গোত্রী কি করবে ঠিক করতে পারছে না। পাশে ওর ছোট ছেলেটা বিরক্ত করছে—মোচার ফুলগুলো আগেই খুলে ছাড়িয়েছে, এবার কাঁচকলাটা নিয়ে পড়েছে নাদুস-নুদুস ফুটফুটে তিন বছরের দামাল ছেলেটা।—ভারী দুষ্টু, কেবল বিরক্ত করে—গঙ্গোত্রী সকলকার কাছেই বলে এ কথা।

—বেশ করে!—শিবেন্দু হেসে বলে।

—তুমি তো বলবেই, ঝামেলা তো ঘাড়ে নাও না।

—তুই তো আরো দুষ্টু ছিলি ও বয়সে।—রাসবিহারী নাতিকে আদর করতে করতে হেসে বলেন। চিত্রা, সুচি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। কিছু বলে না।

আজ ক'দিন হলো গঙ্গোত্রী এসেছে। এসে অবধি মাতিয়ে রেখেছে।

এসেই মার কাছে পা ছড়িয়ে বসে হেসে বলেছে,—আর নড়ছি না মা; ও অজ্-জায়গায় আর যাবো না।

বাসন্তী স্নেহের হাসি হেসে বলেছিলেন,—আমিও তো পাঠাবো না এখন তোকে। ক'বছর বাদে এলি বল্‌তো!

—মিণ্টু তখনও হয়নি মা, সেবা তখন সবে দু'বছরের, সেই তখনইতো গেছি; তুমি মা ওকে বলে দেবে কেমন, ঠাকুর দিয়ে রেঁধে খাবে।

দেবেন একটু যেন পাল্টে গেছে। আগের লাজুক দেবেন এবার যেন একটু চপল হয়েছে। কথায়, ঠাট্টায় এবার ও চুপ করে থাকে না। সুচিত্রার সামনেই গঙ্গোত্রীকে বললে,—বেশ তো যেও না, আমি এবার সুচিকে নিয়ে রওনা দেবো। কি বলো সুচি?

—বেশ তো।—হাসে সুচিত্রা, ম্লান হাসি।

—ভাত রাঁধতে পারবে তো?

সুচিত্রা ঘাড় নাড়ে। কিছু বলে না। মুখে ম্লান হাসির রেশ—এখনও সঙ্কোচ আর দীনতা সুচিত্রার মনে; এড়িয়ে থাকতে চায় ও। কিন্তু বড়দি, জামাইবাবু, বাবা, মা কাছে ডাকে, আদর করে। বড়দি কত ভালো—সুচিত্রা ভাবে আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

—সুচিকে নিয়ে যাও না, শরীরটাও তো ওর খারাপ। যাবি সুচি?

—যাবো।—আস্তে করে বললে সুচিত্রা।

—আমিও যাবো বড়দি। চিত্রা বললে।—এখনও ওর ভাল লাগছে না এখানটা।

—তাই যা না তোরা দু'জনে। গঙ্গোত্রী বললে।

—পুরো গিন্নি হয়ে গেছো দিদি তুমি।—দিব্যেন্দু হেসে বললে গঙ্গোত্রীকে প্রথম দেখে। ভালোও লাগে দিব্যেন্দুর দিদিকে—মাসিমার সঙ্গে যেন খানিকটা মিল আছে দিদির। কত কোমল মুখ। তৃপ্তিতে ভরা হাসি-হাসি প্রতিমার মুখের মত।

—আর তুই হনুমান হয়েই আছিস নাকি।—হেসে বললে গঙ্গোত্রী। খুসীতে ঝলমল করছে ও।

—হনুমান কি মা ?—পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়েটা গঙ্গোত্রীকে জিজ্ঞেস করে।

—তোর ছোট মামা রে, জানিস না তো, কত হুপ হুপ করে গাছে উঠেছে লাফাতে লাফাতে।

—তাই কি ছোট মামা! চল হনুমান হবে চলো না।

—দিদি ভালো হচ্ছে না কিন্তু, ফের বললে এমন জোরে চুল টানবো।—চোখ পাকায় দিব্যেন্দু। অনেক সহজ যেন আজ ও। তবু রাত্রে ঘুম আসে না। পিছনে ফিরে মনটা গুমরোয়। পুরাণো দিনগুলো বেদনা আনে; মেঘের মত ভেসে বেড়ায় ওর মনের আকাশে। এলোমেলো তাই দিব্যেন্দু।

—তা টানবিনে হনুমান, মেজদার দেখে দেখে শিখেছো। মেজদা ও মেজদা।—উচ্চ স্বরে শিবেন্দুকে ডাকে গঙ্গোত্রী। আজ আর বাধা নেই চীৎকার করার।

—শিবু বোধহয় বেরিয়েছে।—বাসন্তী বললেন।

—তা বেরুবে বই কি। সবাই বাড়ীতে আর উনি বাইরে।

—এলে ধমকে দেবে কিন্তু মা।—ছেলেমানুষী মনটা হারায়নি গঙ্গোত্রী।

সকালে রাসবিহারী বাজার করে আনলেন একগাদা।

—এত বাজার! বাবা তোমার যদি একটু বুদ্ধি থাকে। কখন রান্না হবে বলো তো!

—তোরা এতজনে করলে খুব তাড়াতাড়ি হবে।—হেসে বললেন রাসবিহারী।

—তোমাকে তো করতে হবে না কিছু।—বাসন্তী মুখটা ভার করে বললেন।

—বলো না কি করতে হবে, সুচি আয় তো মা, তোতে আমাতে মাছগুলো কুটে ফেলি।

—থাক আর মাছ কুটে কাজ নেই। তুমি যাও দেখি।—বাসন্তী আনাজগুলো গোছাতে গোছাতে বললেন।

দেবেন সুচিত্রা আর চিত্রাকে নিয়ে আসর জমিয়েছে।

—জানো চিত্রা দুঃখকে মেনে নিতে নেই, জয় করতে হয়। মানুষ ক'দিনই বা বাঁচে বলো, তাই যদি মনকে পরিপূর্ণ আনন্দে রাখতে চাও ঘটনাকে মেনেই এগিয়ে যাও। ভেঙ্গে পড়ো না। —দেবেন বললে দরদ ছুঁইয়ে। গল্প করে বুঝিয়ে ওদের মনটাকে ভাল রাখতে চায় দেবেনও। রাসবিহারীকে বলেছিলো দেবেন—কিছু ভাববেন না আপনি, অমন ভালো দাদা যাদের, অমন

ভালো দিদি যাদের, তারা ঠিক ফিরে আসবে সুস্থ মনে। আমিও তো আছি কিছুদিন ; দায়িত্ব আমারও তো।

—বেঁচে থাকো বাবা, তোমরাই পথের আলো দেখাও।

—চিত্রা, ও চিত্রা কোথায় গেলি রে, নে না একবার মিণ্টুকে।—গঙ্গোত্রী উচ্চ স্বরে ডাকে।

—মেজদি চলো, বড়দি ডাকছে। বাবা বোধহয় একগাদা বাজারও এনেছে।

—চ। আসুন না জামাইবাবু, নীচে বসে বসে গল্প করা যাবে।

—চলো।

—ছোড়দি এসেছে দেখ মেজদি।—বিস্ময়ের সুরে বললে সুচিত্রা।

—সত্যি!—দেবেন বললে অবাক হয়ে।

বিচিত্রাকে বুকে চেপে ধরে কাঁদছেন বাসন্তী। শিবেন্দু মিণ্টুকে আদর করছে পাশে দাঁড়িয়ে। গঙ্গোত্রীর আনাজ কোটা বন্ধ হয়েছে। রাসবিহারীও এসে দাঁড়িয়েছেন। চিত্রার ভালো লাগলো দেখতে। ওর মনটাও কেঁদে ওঠে, চোখটাও ভিজে আসে।

—তোমরা কাঁদতেই থাক আজ, রান্নাবান্না হয়ে কাজ নেই।—বঁটিটা কাত করে গঙ্গোত্রী বিচিত্রার কাছে এগিয়ে গেল,—এমন করে রাগ করতে আছে কি রে।—কথা শেষে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো গঙ্গোত্রী।

শিবেন্দুর ভালো লাগে এ ছবি।—অপূর্ব্ব! সত্য-শিব-সুন্দর মিলে এক হয়ে গেছে—শিল্পী শিবেন্দু দরদে-আনন্দে মিশে।কদৃষ্টে চেয়ে থাকলো বাসন্তী, গঙ্গোত্রী, বিচিত্রার দিকে।

মা সঙ্গে কথা কাটাকাটির পর বিচিত্রা উঠেছিলে পার্ক ষ্ট্রিটে লীনার ওখানে। লীনা একা থাকে ওখানে। বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। কিন্তু স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারলো কই ও—মঃ চৌধুরির অনুগ্রহ আর টাকার উপর নির্ভর করে তার খেয়াল-খুশী চরিতার্থের পর নিজের যেন কিছু থাকে না লীনার। সকাল দশটায় ঘুম থেকে উঠেও ওকে বলতে হয়—বড় ক্লান্ত, ভালো লাগে না।

বিচিত্রাও লীনার সুরে সুর মিলিয়েছিলো। বিকেল থেকে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত বেশ কাটে বিচিত্রার। বেশভূষা, খাদ্য-পানীয় আর বিকৃতির উপকরণে নিজে ভুলে থাকা যায়। কিন্তু ভোরের স্বপ্নে যখন ঘুম ভাঙ্গে, তখন বড় নিঃসঙ্গ বিচিত্রা। কোন আত্মীয় নেই তার; এ কথাটাই মনকে নাড়া দেয়—কান্না পায় বিচিত্রার। বাড়ীর জন্যে, ভাই-বোনদের জন্যে তখনই মন হা-হা করে কেঁদে ওঠে। তারপর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ! বিচিত্রার ভয় লাগে; চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে। লীনার সঙ্গে কথা বলতেও ভাল লাগে না তখন তার। লীনা ম্লান হাসে বিচিত্রাকে দেখে। ও বলে,—ওটা কিছু নয়, কেটে যাবে। আমারও হয়েছিলো।—এ অভয়ে বিচিত্রার মন সাড়া দেয় না। বিচিত্রার এমনি মানসিক অবস্থার মধ্যেই শিবেন্দু এলো ওর খোঁজে। শিবেন্দুর সঙ্গে দেখা হতেই বিচিত্রা

যেন নিজেকে কুঁকড়ে ফেললে। রাতে বা বিকালে দেখা হলে হয়ত উপেক্ষা করতে পারতো, করেছেও তো সেই চিত্র-প্রদর্শনীতে। কিন্তু এখন তো নিজেকে ঢাকার ক্ষমতা নেই বিচিত্রার। ঘাড় নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, কথা বলতেও বাধে ওর।

—কি রে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলি কেন? চ বাড়ী চ, তোকে খুঁজতে খুঁজতে তো হয়রান! ওদিকে মা-বাবা-গঙ্গোত্রী গো ভেবে আকুল—নে নে চ খুব হয়েছে, আর মডার্ণ হয়ে কাজ নেই।—উজ্জ্বল হাসিতে ভরা শিবেন্দুর মুখ।

মা-বাবা ভাবছে তার জন্যে! দিদি এসেছে! কিন্তু কি করে তাদের সামনে দাঁড়াবো—দ্বিধা, অনুতাপ, আবেগে মিশে বিচিত্রা কেঁপে ওঠে।

—ভাবছিস্ কেন যা তা, ভাববার কিছু নেই। জীবনে অনেক ভুলই হয়! তা'বলে জের টানতে হবে নাকি? নে চ, জিনিষ কিছু নেই তো?

বিচিত্রা তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে শিবেন্দু ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে কাঁধে একটা হাত রেখে দরদী স্বরে বললে,—মেজদার কথা রাখবিনে রে বিয়াত্রিচে? চ, লক্ষ্মীটি!...

এবার বিচিত্রা প্রথম বর্ষণের মত শিবেন্দুর কাঁধে মাথা রেখে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠলো—সবাই যে যা-তা বলবে মেজদা।

শিবেন্দু ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে,—কেউ কিছু বলবে না রে। দেখবি কত আনন্দ করবে সবাই—চ দেখি।

—ভোলাদা ও ভোলাদা।—গঙ্গোত্রী উচ্চ কণ্ঠে ডাকছে ভোলাকে।—না, চায়ের জল নিজে না বসালে হবে না—গঙ্গোত্রী খুসীতে ঝরে পড়ছে।—মিণ্টু চিৎকার করছে—উঁহুঁ মিত্তি দাও।—দিচ্ছে, দিচ্ছে, দাঁড়া পাজি দিচ্ছি।—সুচিত্রা আদর করে মিণ্টুকে। চিত্রা, বিচিত্রা খাবারের ডিসে সিঙ্গাড়াগুলো সাজাচ্ছে। বাসন্তী রান্না ঘরে ব্যস্ত। দেবেন শিবেন্দু বাগানে পায়চারি করছে। গল্পে জমিয়েছে সেবা আর দিবোন্দু—চ সেবা আমরা চাঁদের দেশেই যাই, সেখানে কত হাসি কত আলো!—যাবি?—হ্যাঁ যাবো ছোটমামা, নিয়ে যাবে তো তুমি?....রাসবিহারী গুণ গুণ করে স্তোত্র পাঠ করছেন স্নান সেরে। বাইরে টাটকা রোদ ঝলমল করছে নীড়ের মানুষদের মত।

সমাপ্ত